ঘটনা প্রবাহ, আমাদের কাজ ও পথ...

ডাঃ মানস গুমটা, সাধারণ সম্পাদক

বিগত কয়েক বছর ধরে বর্তমান রাজ্য সরকার, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অব্যবস্থা, অপ্রতুলতা ইত্যাদি মানুষের চোখের আড়ালে নিয়ে যেতে, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, অন্তহীন প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। ভেতরটা পুতিগন্ধময় হলেও, বাইরেটা চকচকে মুড়ে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ থেকে শুরু করে সব বড় হাসপাতাল, এমনকি BPHC পর্যন্ত সরকারি টাকা খরচ করে সুদৃশ্য গেট নির্মাণ, হাসপাতালগুলিকে নীল-সাদা রঙে রাঙানো, উপযুক্ত চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী, সরঞ্জামের ব্যবস্থা না করেই, বেশ কয়েকটা নীল-সাদা রঙের উঁচু উঁচু বাড়ি তৈরী করে, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বলে চালানো, একদিকে বিনে পয়সায় চিকিৎসার প্রচার অন্য দিকে ফেয়ার প্রাইস ওষুধের দোকানের ভণ্ডামী – যেখানে চলছে সেলের বাজার, দাম বাড়িয়ে দাম কমানোর প্রতিযোগিতা, জেনেরিকের বদলে ব্র্যাণ্ডেড ওষুধ বিক্রির ঢালাও ব্যবস্থা। এসবের বিরুদ্ধে আমাদের সংগঠন ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদী আন্দোলন ও মানুষকে সত্যিটা জানানোর প্রচেষ্টাও করে চলেছে।

এসবের মধ্যে গত বছর ১৫ই ফেব্রুয়ারী, কলকাতা শহরে এক নামি বেসরকারি হাসপাতালে, এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় এক ভয়ংকর হামলা, ভাঙচুর...। নিগৃহীত হন বেশ কিছু চিকিৎসা কর্মী। শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। মানুষের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘোরাতে আবারও শুরু হয় সরকারের ভণ্ডামী। ২২শে ফেব্রুয়ারী, কলকাতা টাউন হলে, সব বেসরকারি হাসপাতালের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক সভা, যা সরাসরি প্রায় সমস্ত মিডিয়াতে সম্প্রচারিত হয়। রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসকের বাচন ভঙ্গিমা, সব কিছুর জন্যে ''যত দোষ নন্দ ঘোষ'' ডাক্তারকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা, ব্যাপক ভাবে প্ররোচিত, প্রভাবিত করে রাজ্যের জনগণকে।

৩রা মার্চ, বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার নামে, এমন একটা বিল (CEA-17) আনা হয় যাতে সব অনিয়ম, বেনিয়মের জন্য মালিকের পরিবর্তে ডাক্তারই চিহ্নিত হয়ে যায়। ডাক্তার সমাজকে বেঁধে ফেলা হয় আইনের দ্বারা। বন্ধ হয়ে যায় নিজস্ব চেম্বারে বসে স্বাধীন প্র্যাকটিস। বন্ধ হয়ে যায় চেম্বারে বসে ইনজেকশন দেওয়া, ড্রেসিং করা, ভ্যাকসিন দেওয়া, সেলাই কাটা। একই সঙ্গে, একই কারণে একাধিক কারণে ডাক্তারদের শাস্তি দেওয়ার বিধান নির্ধারিত হয় ওই বিলে।

এই দু'টি বিষয় ডাক্তারি পেশাকে খাদের কিনারায় পৌঁছে দেয়। সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হয় এক অস্বস্তিকর, অনাকাঙ্খিত, ভয়ংকর এক অস্থিরতা। একের পর এক ঘটতে থাকে ডাক্তার নিগ্রহ, হাসপাতাল ভাঙচুর। এই সময়েই আমরা দেখলাম সরকারি হাসাপাতলে ডাক্তারের গায়ে বিষ্ঠা মাখানোর ঘটনা। মাথায় বন্দুক ধরার ঘটনা, আরও অনেক কিছু। এসবের কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও, বেশিরভাগটাই সংগঠিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত।

এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ইতিহাস রচনা করলো। প্রতিবাদে, প্রতিরোধে শুরু হল লাগাতার মিটিং, মিছিল, কনভেনশন, রাস্তায় নামা। আতঙ্কিত, বিধ্বস্ত, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ডাক্তার সমাজ জোট বাঁধলো বিভিন্ন সংগঠনের নামে। ভয়-ভীতি, পিছুটান, রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে শয়ে শয়ে সরকারি, বেসরকারি ডাক্তারদের একাধিক মিছিল আছড়ে পড়লো রাজপথে। আমরাও ছিলাম রাস্তায় – ধারাবাহিক ভাবে, একক ভাবে, যৌথ ভাবে। এই অস্থিরতা, এই আক্রমণের বিরুদ্ধে।

এই অসহায়, বিপন্ন, প্রতিনিয়ত অপমানিত ডাক্তারদের পাশে না দাঁড়িয়ে সরকারের ভূমিকা ছিল মূক ও বধিরের। কোন কোন ক্ষেত্রে সক্রিয় প্ররোচনাও লক্ষ্য করি আমরা। শুধু তাই নয় – পরপর নামিয়ে আনা হয় নতুন নতুন আক্রমণ। সংগঠন করা, সংগঠনের বাক্‌স্বাধীনতা, ব্যাক্তি স্বাধীনতার ওপর চলে দমন-পীড়ন।

সোশ্যাল মিডিয়াতে অসহায়তার কথা লিখে সাসপেন্ড হয়ে যান ডাঃ অরুণাচল দত্ত চৌধুরী। সংবাদ মাধ্যমে সংগঠনের বক্তব্য জানানোর জন্যে শো-কজ করা হয় আমাদের সভাপতি ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায় ও সহ-সম্পাদক ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামীকে। এসবের বিরুদ্ধেও পথে নামে শত শত ডাক্তার, ব্যক্তি, সমষ্ঠি, রাজনৈতিক বিশ্বাসের উর্দ্ধে উঠে , সংগঠিত হয় স্বাস্থ্যভবন অভিযান। ডেপুটেশন নিতে অস্বীকার করেন স্বাস্থ্য প্রশাসকরা। ১৪৪ ধারা জারি করে অনেক আগেই আটকে দেওয়া হয় সংঘবদ্ধ যৌথ মিছিল।

এরকমই একটা সময়ে আমাদের সংগঠনের ২২তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৩শে মার্চ, ২০১৮ রাজ্য যুবকেন্দ্র, মৌলালিতে। শুরুতে অনেক দোলাচল থাকলেও, পরবর্তী সময়ে নেতৃত্ব ও সদস্যদের উদ্দীপ্ত ভূমিকা এই সম্মেলনকে এক অসাধারণ সফল সম্মেলনে পরিণত করে। গত কয়েক বছরের থেকে বেশী সদস্য সংগ্রহ করে আমরা এই সম্মেলন করি। আমরা চিহ্নিত করি লড়াইয়ের পথের। চিহ্নিত করি আমাদের দুর্বলতা। নির্ধারণ করি ভবিষ্যতের পথ ও কর্মসূচী।

পরিস্থিতির ব্যাপকতা আমাদের বাধ্য করে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ানোর। সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই আমরা ডাক দেই আরও বড় যৌথ আন্দোলন কর্মসূচীর। ৩০শে মার্চ, ২০১৮ কলকাতা দেখে এক নতুন লড়াই। একই সঙ্গে অনশন, অবস্থান, মিছিল, ডেপুটেশন -- কর্মস্থানে সিকিউরিটি, ২০০৯ মেডিকেয়ার আইনে দোষীদের গ্রেফতার ও ডাঃ অরুণাচল দত্ত চৌধুরীরর সাসপেনশন প্রত্যাহার ইত্যাদি বিভিন্ন দাবীতে। যৌথ মঞ্চের এই বিরাট লড়াই এই প্রথম সরকারকে বাধ্য করে ডেপুটেশন নিতে। আলোচনা করতে। যদিও সেই আলোচনা খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল এমনটা নয়।

২রা এপ্রিল ২০১৮ তারিখ এই সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তার সর্বোচ্চ প্রশাসনের উপস্থিতিতে সভা করেন আন্দোলন রত ডাক্তার সংগঠনগুলির সাথে। আলোচনা হয় violence নিয়ে, CEA-17 নিয়ে ও VR, TR, ট্রান্সফার নিয়ে। একরাশ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষে। কিছু আশা কিন্তু বেশীটাই আশঙ্কা নিয়ে আমরা ফিরি। তারপরের একমাস আমাদের আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হয়। ডাক্তার নিগ্রহ কমার পরিবর্তে ঘটে চলে আরও দ্রুত গতিতে। এম্বুলেন্স নেই কেন এই অজুহাতে RKS-এর সদস্য মাথা ফাটিয়ে দেয় পুরুলিয়ার ডাঃ বিপ্লব মণ্ডলের। শিলিগুড়ি, কাকদ্বীপ, পাসকুড়া সহ নানা জায়গায় ঘটতে থাকে ডাক্তার নিগ্রহ, হাসপাতাল ভাঙচূর। এমনকি একই দিনে ঘটে যায় চার চারটি ডাক্তার নিগ্রহ ও হাসপাতাল, নার্সিং হোম ভাঙচূরের ঘটনা। পুরুলিয়ার সংগ্রামরত ডাক্তারদের পাশে দাঁড়াতে সমস্ত বিভেদ ভুলে ডাক্তাররা এক ঘন্টার OPD ধর্মঘট করেন। মিছিল করেন, প্রশাসনকে ডেপুটেশন দেন। পুরুলিয়ার সংগ্রামরত ডাক্তারদের পাশে দাঁড়াতে আমরাও সারা পশ্চিমবঙ্গে একই দিনে কালো ব্যাজ পরার, CMOH-দের ডেপুটেশন দেওয়ার এবং কেন্দ্রীয়ভাবে DHS-কে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করি যা ব্যাপক সাফল্য পায়। অন্য সংগঠনগুলিও আমাদের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। একই সঙ্গে চলতে থাকে সার্ভিসের বিষয় যেমন ডিউটি রোস্টার, TR, লিভ রুল এসব নিয়ে আমাদের নিজস্ব আন্দোলন সংগ্রাম, একাধিকবার আমরা ডেপুটেশন-এ যাই স্বাস্থ্য প্রশাসকদের কাছে।

কিন্তু প্রশাসকদের মেরুদণ্ডহীনতা, সরকারের নীরবতা, প্রতিশ্রুতি পালন না করা এবং এসবের কারণে ডাক্তার সমাজের অসহনীয় ক্ষোভ আমাদের বাধ্য করে আরও বড় আন্দোলনে নামতে। আমাদের সংগঠন ডাক দেয় এক অন্যরকম আন্দোলনের। রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবার, পরিবার পরিজনদের নিয়ে মুখে কালো মাস্ক বেঁধে, সন্ধ্যেবেলা, মোমবাতি নিয়ে মৌন প্রতিবাদ মিছিল ও ''লালবাজার চলো'' ডাক দিই। আমাদের ডাকে পাশে এসে দাঁড়ায় আরও অনেক চিকিৎসক সংগঠন। দ্রুত এই আন্দোলনের ডাক সারা রাজ্যের ডাক্তার সমাজকে আলোড়িত করে।

১১ই মে কলকাতা সহ সারা রাজ্য দেখলো ইতিহাস রচনা। ৮০ বছরের বৃদ্ধ মা-বাব, বউ, সন্তান, সমব্যাথী মানুষ সহ শ'য়ে শ'য়ে ডাক্তার নেমে এলেন রাজপথে। ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তারা হাঁটলেন রাজপথে। আমাদের সংগঠনের এ এক বিরাট সাফল্য।

ঘটনাপ্রবাহ আমাদের সংগঠনের সক্রিয়তা যেমন অনেক

বাড়িয়েছে, তেমনি অনেক নতুন নতুন সদস্যকে ভয় ভাঙিয়ে আমরা লড়াইয়ে সামিলও করতে পারছি। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কোন পথে চলেছি – একটা কথা ঠিক – ব্যক্তি, সমষ্ঠি, রাজনৈতিক বিশ্বাস এসবের উর্দ্ধে উঠে, একতা এবং যৌথ আন্দোলনই এই সময়ের দাবী। একই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তার ধার ও ভার দুটোই বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। ধারাবাহিকতাও রাখতে হবে। কিন্তু সংগঠনগতভাবে বেশ কিছু দুর্বলতা আমাদের থেকেই যাচ্ছে। শাখা ভিত্তিক, জেলা ভিত্তিক নিয়মিত কর্মসূচী আমরা নিতে পারছি না। সদস্যদের সঙ্গে প্রাণবন্ত যোগাযোগ রাখার ব্যাপারেও আমরা পিছিয়ে। সদস্য নন এমন ডাক্তারদের আমাদের আন্দোলনে সামিল করা, আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া – এসব বিষয়েও আমাদের এখনো অনেক দ্বিধা, দুর্বলতা রয়ে গেছে। ভায়োল্যান্স ও অন্যান্য ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে আক্রান্তের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, প্রতিক্রিয়া দেখানো বা শাখা ভিত্তিক কর্মসূচী নেওয়ার ব্যাপারেও আমরা পিছিয়ে থাকছি। শুধু কেন্দ্রীয় কর্মসূচী আমাদের খুব বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে না। ডাক্তারদের মধ্যে, বিশেষ করে সার্ভিস ডাক্তারদের এক বড় অংশ বিভিন্ন রকম আক্রমণের শিকার। তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে, ব্যাপক অসন্তোষ তৈরী হচ্ছে। সার্ভিসের নিজস্ব বিষয় যেমন –VR-এর অধিকার বন্ধ করে দেওয়া, NEET PG পাশ করার পরেও TR না দিয়ে গ্রামে কর্মরত এক বিরাট সংখ্যক ডাক্তারকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা, Duty Roster-এর তুঘলকি ফরমান, ছুটি নেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন নিয়মের জটিলতা এবং দীর্ঘদিন, বিশেষ করে মেডিক্যাল বা গুরুতর পারিবারিক কারণেও বদলি বন্ধ থাকা। এই সমস্ত ডাক্তারদের ক্ষোভকে ভাষা দেওয়া, সংগঠনের কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং লনাইয়ে সামিল করার দায়িত্ব আমাদের এই সময়ের কাজ।

ঐক্য ও সংগ্রাম

চিকিৎসকরা বর্তমানে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। অথচ ডাক্তাররা এর জন্য মোটেই দায়ী নয়। যারা দায়ী তারা আড়াল থেকে ডাক্তারদের মানুষের ক্ষোভের সামনে ঠেলে দিচ্ছে। সরকারি কর্তাব্যক্তিরাও বিভিন্ন বিষয়েই ডাক্তারদের দিকে আঙ্গুল তুলতে পারলে খুশি হচ্ছেন। উপরন্তু সারা দেশ জুড়ে অশান্তির আবহাওয়া। অসহিষ্ণুতা একটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে। প্রশাসনিক সাহায্য না পাওয়া, মানুষের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়া, সবদিক থেকে ডাক্তাররা আক্রান্ত, কিছুটা হলেও বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় ডাক্তারদের নিজের লড়াই নিজেদেরই লড়তে হবে। নিজের কাজে সৎ থাকতে হবে। সমগ্র চিকিৎসক সমাজকে এক হয়ে লড়তে হবে। আমরা সেই পথে এগিয়েছি অনেকটাই। আরও বহুদূর যাওয়া বাকি। অন্যান্য পেশাজীবীরাও আক্রান্ত। তাদের সাথে এক হয়ে লড়তে হবে। মানুষের অবস্থার কথা ভাবতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আমরা ঠিক করেছি আমাদের সংগঠনের সদস্য নয় এমন চিকিৎসকদের লেখা আমরা গ্রহণ করবো। সহমর্মী মানুষদের লেখাও পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবো। অর্থকরী সাহায্য পেলে খুবই ভালো লাগবে। আশা করি, সকলে পাশে দাঁড়াবেন। সংগঠনের লেখা ছাড়াও কোনও বিষয়গত লেখাও আমরা আহ্বান করছি।

ধন্যবাদান্তে

ডাঃ গৌতম দাস
সম্পাদক, নিউজ লেটার

স্বাস্থ্যনীতির খসড়ার উপর আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ

বক্তা – শ্রী মানবেন্দ্রনাথ রায়, অণুলিখন – ডাঃ গৌতম দাস

সকলকে অভিনন্দন। স্বাস্থ্যনীতির খসড়ার উপর আলোচনা করতে গেলে তার পরিপ্রেক্ষিতটিকে আমাদের বোঝা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকেই পরিবর্তন ঘটেছে। নয়া উদারনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। এগুলির সম্যক প্রভাব স্বাস্থ্য, পরিষেবা ক্ষেত্রে পড়েছে। শুধু তাই নয় – সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছে। এখন যা করতে চাওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে সমাজের কোন অংশ তাতে উপকৃত হচ্ছে। NRHM (National Rural Health Mission) – এতে উপকৃত হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার কিছু জায়গায় হস্তক্ষেপ করা গেছে - উন্নতি হচ্ছে। শিশুমৃত্যুর হার, মায়েদের মৃত্যুহার ভালো হয়েছে। সামগ্রিক রোগের যে ভার – (overall disese burden) তাতে এই শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যুর উন্নতির প্রভাব খুব কম - এটা সত্যি। সমস্ত মৃত্যুর মধ্যে মাতৃমৃত্যুর অংশ হলো মাত্র ০.৫৫ শতাংশ এবং ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের মোট মৃত্যুর মাত্র ৪ শতাংশ। সাধারণভাবে স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে এর প্রভাব খুবই কম, আন্তর্জাতিক মানের ধারে কাছেও নেই – তবুও উন্নতি হয়েছে। আরও উন্নতি করা উচিত। হলে খুবই ভালো। NRHM-এর ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান ভালো হয় নি – এটা একটা ব্যর্থতার দিক। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা যদি আমরা খেয়াল করি, তবে দেখবো ৫২ শতাংশ কমিউনিটি হেলথ সেন্টার (CHC) First referral unit (FRU)-এ উন্নীত হয়েছে। তার মধ্যে ১৮.৭ শতাংশ সিজারিয়ান সেকশন অপারেশন হয়, FRU-এর এক চতুর্থাংশে অবস্টেট্রিশিয়ান আছেন। অর্থাৎ কিছুটা উন্নতি হলেও বিরাট কিছু হয় নি। সামগ্রিক রোগের প্রকোপের দিকে তাকালে দেখা যাবে অসংক্রামক (non-communicable) রোগের অংশ হলো ৩৯.১ শতাংশ, সংক্রামক রোগের (infectious disease) অংশ হলো ২৮.৮ শতাংশ এবং শিশু ও মাতৃকালীন রোগের অংশ হলো ১৩.৮ শতাংশ। আবার অসংক্রামক রোগের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। আঘাত জনিত মৃত্যুর হার হলো ১৪ শতাংশ। সংক্রামক রোগের সাথে যুক্ত হয়েছে – আরও নতুন অবস্থার উদ্ভবের ফলে সৃষ্ট কিছু রোগ যেমন মধুমেহ বা Diabetes। আগে যে বয়সে ডায়াবেটিস হতো না, এখন সে বয়সে হচ্ছে। কম বয়সে ডায়াবেটিস হচ্ছে বেশী। বলা হচ্ছে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করার কথা। এখানে মনে রাখতে হবে বিগত দিনের ব্যর্থতাগুলি, যা আলোচিত হয় নি। সংক্রামক রোগের নিয়ন্ত্রণ ভালো করে হয় নি। AIDS– খানিকটা কমেছে, পুরোটা নয়। ২০০১ সালে AIDS-এর prevalence ছিলো - ০.৪১, ২০১১ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে - ০.২৭-এ।

যক্ষা (Tuberculosis) : RNTCP (Revised National Tuberculosis programme) এখন প্রতিষ্ঠিত প্রটোকল। সরকারি ব্যবস্থায় বিনামূল্যে এই ওষুধ দেওয়া হয়। তবুও ৫০ শতাংশ এর বেশী TB রোগী বেসরকারী ক্ষেত্রে চিকিৎসা করান (কলকাতায়)। একটি TB রোগী গড়ে তিনজন ডাক্তারকে ব্যক্তিগতভাবে দেখানোর পরে RNTCP-তে আসে। আসার কারণ – ভুল রোগ নির্ণয় (wrong diagnosis), চিকিৎসা ব্যর্থতা (Treatment failure) এবং বহু ওষুধের কার্যকারীতা নাশ (Multidrug resistance) হলে তবেই আসে। অনেকেই জানে না RNTCP-তে বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যায়।

প্রতি তিনটি পুরুষ TB রোগীপিছু একজন মহিলা TB রোগী চিহ্নিত হন। ঠিকমতো চিহ্নিত হয়ও না (detection)-লিঙ্গ বৈষম্য (gender bias) আছে।

ভারতে সমস্ত মেট্রোপলিটন শহরগুলির মধ্যে কলকাতা এমন একটি শহর যেখানে রোগ নির্ণয় (case detection) এবং নিরাময়ের হার (cure rate) খুবই কম। কীট বাহিত রোগ (vector borne disease) বেড়ে চলেছে। শুধু সরকারি ব্যবস্থা দিয়ে হবে না। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ শুধু

ডাক্তারদের কাজ নয়। অন্যান্য অংশের মানুষকেও লাগবে (multidisciplinary approach) – এটি ঠিকমতো ভাবনায় আসে নি।

জনস্বাস্থ্য (Public Health) : এটি রাজ্যের বিষয়, কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি – জাতীয় বিষয়। সেজন্য জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি রাজ্যের স্বাস্থ্যনীতি, স্থানীয় সরকারি (পঞ্চায়েত, পৌরসভা) ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যনীতির মধ্যে যদি সাজুয্য না থাকে, তবে গন্ডগোল। শুধুই জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি যথেষ্ট নয়। টাকার ক্ষেত্রে এটা বেশী করে ভাববার। কোনও একটি প্রকল্পে দশ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হলে আড়াই হাজার কোটি টাকা হয়তো রাজ্য দিলো, কেন্দ্র ৭৫ শতাংশ দেবে – তবে অবশ্যই তা' দিতে হবে – নতুবা হবে না। অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলি এক হতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে।

পরিষেবার খরচ (Cost of Delivery) : খরচের ৮২ শতাংশ করে থাকে বেসরকারি ক্ষেত্র। এই খরচ কমানোর জন্য বীমাকে (insurance) ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের দেশের জনগণের ২৭ শতাংশ RSBY ও অন্যান্য বীমার আওতায় আছে।

চটকল (Jute Mill)-এর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে – শতকরা নিরানব্বই ভাগ কর্মচারী ESI-এর আওতাভুক্ত, ৬৬ শতাংশ বেসরকারি ক্ষেত্রের সুবিধা গ্রহণ করছে।

সরকারি পরিষেবা পাবার (access) ক্ষেত্রে দুর্বলতা আছে। সরকারি প্রশাসনিক জটিলতা (Governance), কর্মদক্ষতা (efficiency), দায়িত্ববোধ (accountability) – এগুলি খুবই দুর্বল।

বলা হচ্ছে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা শিল্প (Private Health Care Industry)-এর কথা। স্বাস্থ্যের পণ্যায়ন হচ্ছে। ভারতবর্ষ এই শিল্পে লগ্নি করার মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই ধরণের শিল্পপতিদের কাছে ভারতবর্ষ হল দ্বিতীয় পছন্দের জায়গা (সারা পৃথিবীতে)। বিদেশ থেকে এই ক্ষেত্রে যার জন্য প্রচুর লগ্নি হচ্ছে – যার মধ্যে FDI (Foreign Direct Investment)-ও আছে। তারা অর্থ বিনিয়োগ করছে, কিন্তু চিকিৎসক নয়। অতএব বেসরকারি ক্ষেত্রে যে ডাক্তারকে সরবরাহ করতে হবে তা সরকারি ক্ষেত্র থেকে করতে হবে। ফলে বেসরকারি পুঁজির ব্যবসা বাড়বে সরকারি চিকিৎসকদের ঘাড়ে চেপে। অন্যদিকে যেহেতু সরকারি চিকিৎসকের একটা অংশ (share) বেসরকারি-তে যাবে, সরকারি কর্মসূচীতে ঘাটতি পড়বে। পরিষেবার মান খারাপ হবে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি বৃদ্ধি বা বেসরকারিকরণ খুবই দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রের তুলনায়, তা দ্বিগুণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির তুলনায় তা তিনগুণ। কোনও ক্ষেত্রে (sctor) যাদি লাভ (profit) বেশী থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে থাকে। আবার সেই ক্ষেত্র লাভের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয়, তা সরকারি তথা জনস্বাস্থ্যের ধারণার উল্টোপথে চালিত হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রের উৎসাহের দিকটি হলো – লাভ (profit), তারা চাইবে সেই লাভকে সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে যেতে। আবার সরকারি ক্ষেত্রের দর্শন হলো – সকলের জন্য স্বাস্থ্য যাতে ব্যক্তি মানুষকে ন্যুনতম খরচ করতে হয়। ধরাণা দুটি পরস্পর বিরোধী (conflicting)।

Incidence of Catastrophic Expenditure on Health কাকে বলবো Catastrophic Expenditure?

যখন কোনও ব্যক্তি মাসিক ব্যয়ের দশ শতাংশের (>10%) বেশী স্বাস্থ্য খাতে খরচ করে বা খাদ্য ছাড়া মাসিক ব্যয়ের চল্লিশ শতাংশের বেশী (>40%) স্বাস্থ্য খাতে খরচ করলে তাকে Catastrophic Expenditure বলা হয়।

"Attainment of universal access to affordable health care services in an assured mode ....." অর্জন করতে হবে, কিন্তু কিভাবে সেটা বলা হচ্ছে না। তার নির্দিষ্ট দিশা নেই। প্রকৃতপক্ষে অর্জন করা সম্ভব হবে না।

যে কটি জিনিষের উপর Health Care দাঁড়িয়ে থাকে, তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো – প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা [প্রতিরোধক এবং বিকাশমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা (Preventive and Promotive Health Care)] - এগুলি সরকারি ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং তার পরিষেবা ভারতীয় জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার

নিরীখে অনেক পিছিয়ে। বেসরকারিকরণের ফলে যেটা হবে – নতুন, কমবয়সী ডাক্তারদের বেসরকারি হাসপাতালগুলি গিলে নেবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কেউ যেতে চাইবে না। বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation) করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, বিশেষতঃ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। তারা (নতুন ডাক্তাররা) গ্রামে থাকতে আগ্রহী হবে না, পুঁজি তাদের টানবে – শহুরে চিকিৎসা কেন্দ্রের দিকে। ফলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ভুগতে হবে।

আমাদের এই অঞ্চলে শ্রীলঙ্কার প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থা সবথেকে ভালো। তাতে তারা পুরানো ও tier system-কে শুধু রক্ষা করেছে, তাই নয়, শক্তিশালী করেছে। আমাদের এখানে সেরকম কিছু বলা হয় নি। ASHA সব কিছু করতে পারবে না। প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক (Preventive and Curative) স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্থানীয় সংস্থাগুলি (পৌরসভা, পঞ্চায়েত প্রভৃতি) কি করতে পারবে – তার roadmap নেই। কেন্দ্রীভূত প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা (Centralised Primary Health Care) হয় না, কারণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি আঞ্চলিক স্তরে স্বাস্থ্য নির্ণায়ক কিছু উপাদানকে (Health determinant) স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

এরকম কিছু নির্ণায়ক উপাদানের কথা ভাবা যেতে পারে যেমন – মাতৃত্ব ও শিশুর পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে দায়িত্ব কে নেবে? অনুরূপ ভাবে পরিচ্ছন্নতা (sanitation) ও তৎসংক্রান্ত বিষয়, পানীয় জল / বায়ু দূষণ – এগুলির দায়িত্ব কে নেবে?এগুলি যতদিন থাকবে, রোগের প্রাদুর্ভাব ততদিন থাকবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে – প্রাথমিক (Primary), মধ্যবর্তী (Secondary) ও শীর্ষ (Tertiary) স্বাস্থ্য পরিষেবায় যে লগ্নি করা হচ্ছে (investment) তার লাভ (return) কি হচ্ছে, তার উল্লেখ নেই। একটি দেশে সেখানেই লগ্নি করা উচিত, যেখানে লাভ আসবে। অবশ্যই এই লাভ মানুষের উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নিরীখে ভাবতে হবে, শুধু ঠাকার ভিত্তিতে নয়।

আরেকটি বিষয় হলো প্রতিরোধক ব্যবস্থাতে মানুষ সহজে আকৃষ্ট হয় না। মানুষের কাছে খুব একটা বোধগম্যও নয় বিষয়টি। ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ করা দরকার - মানুষ চট করে এই দাবী করবে না, কিন্তু ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা হোক, এটা সহজেই মানুষের দাবী হবে। প্রতিরোধের সার্থকতা কোথায় – লোকে বুঝতে পারবে না। সে কারণে প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য শক্তিশালী নীতি (policy) থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের পণ্যায়ন হলে এটা বেশী করে দরকার। নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে (ear marked) প্রতিরোধ মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য।

অন্ধ্রপ্রদেশে ''রাজীব আরোগ্যশ্রী যোজনা'' রাজশেখর রেড্ডির সময়ে হয়েছিলো। খুব খারাপ অভিজ্ঞতা। সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বাজেট কমাতে হয়েছিল; hospitalisation, investigation, LUCS প্রভৃতিতে ব্যয় প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২৭ শতাংশ বাজেট এর জন্য খরচ হয়েছিল। বেসরকারীকরণের এটা একটা বাজে শিক্ষা। Health care delivery is transactive service (technically called) – যেখানে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপরে অনেক স্বাধীনতা থাকে, অনেক মত (option) থাকে। PPP (Public Private Partnership) / outsource is non-transactive – কোনও স্বাধীনতা থাকে না। অপ্রয়োজনীয় ইনভেস্টিগেশন হবার সুযোগ বেশী হবে। যেখানে outsourcing হবে, সেখানেই হবে।

সরকার বলছে outsourcing করবে secondary এবং tertiary ক্ষেত্রে। Private sector-এর বৃদ্ধি হবে, সরকার খরচ করবে। Private sector, private gain করার জন্য কাজ করবে - রোগীদের শুষে নেবে। Technology-এর অপপ্রয়োগ (abuse) হতে পারে।

স্বাস্থ্য বাজেট : এক শতাংশের মতো আমরা করি। ২০০২-এ বলা হয়েছিলো দুই শতাংশ করা হবে – হয় নি। জাপান, নর্ডিক দেসগুলি GDP-এর ১০ শতাংশের বেশী স্বাস্থ্যখাতে খরচ করে।

বিশ্ব জোড়া আর্থিক সংকটের ফলে Private capital খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় তাদের আয় বাড়বে।

সরকার বলঠে – এই সুযোগ গ্রহণ করো। উদ্বৃত্ত অর্থ (surplus) সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ঢালো। বলা হচ্ছে অর্থনীতির বিকাশ হচ্ছে। এখন একটা হতে পারে – অর্থনীতির বিকাশ হোক, তার সুফল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। সেটা যদি বেসরকারি পুঁজিকে উৎসাহ যোগায় (fuelling), স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির বৃদ্ধি ঘটায় – তার শেষে কি হবে? তার পথটাই বা কি হবে?

মুনাফা, লাভ (Profit) এই কথাগুলি ঘুরেফিরে আসছে। প্রযুক্তিগত নির্ভরতা (Technologycally driven [diagnostics, investigation]) - পুঁজি নির্ভর হওয়ার ফলে ক্রমশই মুনাফা নির্ভর (profit driven) হয়ে ওঠে – এর (investigation) অপপ্রয়োগ (abuse) হতে বাধ্য।

Drug policy বিশেষতঃ Pharma industry কিভাবে ওষুধের চাহিদা মিটবে? জেনেরিক নামে ওষুধ তৈরী বা বিক্রী নয় কেন? বাংলাদেশে ৯৮ শতাংশ ওষুধ জেনেরিক নামে বিক্রী হয়।

সরকার ওষুধ কেনে এবং বিনামূল্যে রোগীদের দেবে। রোগীদের কাছে বিনামূল্যে মানে সরকারের কাছে সেটা বিনামূল্যে নয়। সরকারকে তা কিনতে হয়। এই অবস্থায় ওষুধের কার্যকারীতা হ্রাস খুব বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই বেসরকারি লাভ এবং সরকারি উদ্দেশ্য (রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া) – একসাথে হতে পারে না।

প্রভাব কি হবে? (Impact): Private Health Care (বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান) যদি বাড়ে, সরকারের পক্ষে ডাক্তার যোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়বে। শহরকেন্দ্রীক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, বিকেন্দ্রীকরণ হবে না। Private Health যেখানে লগ্নি করবে না, যেমন – Trauma, Geriatric, Mental Health ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

Private Sector কে কাজ করাতে গেলে strong regulation দরকার, যা ঠিকমতো নেই। যা regulation আছে, তা'ও খুব জটিল এবং ঠিকভাবে কার্যকরী নয়। অন্ততঃ Telephone, insurance এর মতো নয়। অপ্রয়োজনীয় (irrational) prescriptionএর সংখ্যাও প্রচুর।

চিকিৎসকের স্বল্পতা : এটা তো জানা তথ্য। তাদের কার্মক্ষমতা, সংখ্যা বাড়াতে হবে। Private sector ও Public sector-এ চিকিৎসকদের একটা সামঞ্জস্য, সাম্য (equity) বজায় রাখা প্রয়োজন।

নৈতিকতা (Ethical issues): Medical ethics - এটি একটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক - রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে। এখন চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেকের আগমন ঘটেছে। যেমন – নার্স, investigation করেন এমন বিশেষজ্ঞ, প্রশাসক (administrators)। এখন আর ডাক্তার রোগীর সম্পর্ক একমাত্রিক (১:১) নয়। যা কিছু নৈতিক, তা' সর্বদা সস্তা (cheap) নয়। লাভ এবং নৈতিকতা (profit and ethics) এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব (conflict) আছে। Private sector নৈতিকতায় ঢিল দেবে। যত Private sector বেড়ে উঠবে, নৈতিকতা নিয়ে তত প্রশ্ন উঠবে।

A Recapitulation on Dengue

Dr. Siddhartha Mukherjee

What it is —

Dengue is a viral disease. It is estimated that about 50 millions dengue cases occurs annually and 2.5 billion people live in dengue-epidemic countries. Fatality may be 1%, but in India, Indonesia and Myanmer case-fatality rates are as high as 3-5%.

Agent —

A single stranded RNA virus composing of 4 distinct Serotypes (DEN -1 to 4).

Vectors —

Infected Aedes Aegypti transmits the Dengue virus to humans. These Aedes Mosquito having white stripes on body & legs, hence called "Tiger Mosquito". Only female Aedes Mosquito bite, during daytime. only female mosquito become infective after biting a person carrying the virus and once infected the mosquitoes remain infective for life and passes on the virus to the eggs it lays.

Peak biting times - at dawn and dusk - 2 hours after sunrise and 2 hours before sunset.

The mosquitoes have a limited fly range and a few mosquitoes can produce large dengue out-breaks.

Humans develop disease after 5-6 days of being bitten by an infective mosquito.

How to protect yourself —

1. wear full sleeves clothes and long dresses to cover as much of your body as possible.
2. Use Repellants, mosquito coils, electric vagor mats during daytimes to prevent dengue.
3. Use mosquito nets to the patients and children, elderly who may rest at daytimes.

Clinical description —

Dengue Fever (Classical)

An acute onset of high fever of 2-7 days duration with 2 or more of the followings —

1. Headache,
2. Retroorbital pain,
3. Myalgia,
4. Arthralgia,
5. Generalised body ache,
6. Rash
7. A positive tourniquet test,
8. Mild haemarragic manifestations such as peteche, epistonis, gum bleeding, easy bruising etc.

Critical phase —

As temperature drops in some cases, Dengue fever may turn critical usually after 3-5 days of illness. Plasma leakage starts to extra vascular spaces. Where capillary permeability increases, the patient's condition deteroiates and where capillary permeability does not increase patient's condition improves.

Pleural effusion and Ascites develop and leads to failure of circulatory system unless treated with fluid resuscitation.

Warning signs —

1. Severe abdominal pain,
2. Red spot or patches over the body,
3. Bleeding from nose or gums,
4. Vomiting blood,
5. Melaena,
6. Drowsiness & Irritability,
7. Pale, cold and clammy skin,
8. Respiratory distress

Patients with severe shock may lead to multiorgan failure & Disseminated intravascular clotting (DIC). This may produce severe haemarhage from different sites. Severe hepatitis, encephalitis or myocasditis may ensue and leads to death.

One point to remember that major bleeding may occur without prolonged shock when Aspirin, Brufen or corticosteriod have been taken.

However, most death from dengue occurs in patients with profound shock; particularly complicated with fluid overloads.

Recovery phase —

If the patients survive, 24-48 hours of critical phase, gradual resorption of extravascular fluid takes place and patient gradually recovers. Haematocrit stabilises and WBC count rises and platelet count stabilises.

Can people get dengue again?

Yes, if the person have suffered from one strain, may be affected by a different strain.

So, a person could suffer from dengue more than once in his or her lifetime.

Management of Dengue —

Step - 1: Overall Assessment

History including information on symptoms, past medical history and family history. If it is associated with change of mental state / seizure / dizziness or with diarrhoea or with travelling to Dengue Endemic Zone, co-existing conditions such as infancy, pregnancy, diabetes, hypertension.

Physical examination

1. Assessment of mental state,
2. Assessment of hydration status,
3. Checking of tachypnoea, acidosis, breaking if any,
4. Checking of abdominal tenderness,
5. Examination of Rash or bleeding manifestations,
6. Tourniquet test.

Clinical description of classical Dengue

An acute onset of high fever of 2-7 days of duration with (i) Headache, (ii) Retroorbital pain, (iii) Myalgia, (iv) Arthralgia, (v) Rash, (vi) Haemarrhogic manifestations, if any.

What to do if you think you have a dengue case

1. Bed rest,
2. Cold sponging,
3. Avoid aspirin, brufen etc to prevent gastritis, vomiting and it may produce future damage during recovery phase.
4. Only drug is Paracetamol,
5. Oral electrolyte therapy.

Investigations —

A full blood count should be done in first visit. A decreasing white clood cell count indecates Dengue. A rapidly decreasing platelet count parallal to rising haematoerit is suggestive of progress to plasma leakage / critical phase of the disease.

Dengue specific test —

1. Detecting Dengue Antigen in blood within first 5 days of onset of symptoms (NS_1 - Antigen or non-structural protin),
2. IGM antibodies become positive in 5-7 days of illness in 80% of cases. By the end of 10th day IGM becomes positive. It reach a peak at 2 weeks and thereafter starts declining, becomes undetectable in 2-3 monthsIGM antibodies are in low ..... in the end of 1st week, then gradually increases and remain detectable for several months, probably for life time. Most peoples with Dengue will recovers in 1-2 weeks time.

Prevent dehydration—

Dehydration can occur when a person loses too much fluid from high fever, vomiting. Give plenty of fluid-ORS and juices are preferable and watch for dehydration.

Management decisions —

Depending on clinical manifestation and other circumstances, patients may be —

1. Sent home (Group-A)
2. Being admitted (Group-B)
3. Emergency treatment and urgent referal (Group-C).

Group-A —

Sent Home

— These patients can tolerate adequate volumes of oral fluid and pass urine at least once in 6 hours.

— Do not have any warning signs.

In Home

— Give adequate oral fluid, fruit juice, oral electrolyte solutions.

— Give paracetamol. No Aspirin, No NSAIDS.

— If any warning signs appear or the clinical condition deteroiates then they should be immediately admitted.

Warning Signs —

1. Severe abdominal pain or persistent vomiting.
2. Red spots or patches on the skin.
3. Bleeding from nose or gums.
4. Vomiting blood.
5. Black tarry stool.
6. Drowsiness or irretability.
7. Pale, cold clammy skin.
8. Difficulty in breathing.
9. Not passing urine for more than 4 hours.

Group-B

Indoor Management

— Patients includes with warning signs.

— Coexisting other conditions (pregnancy, infancy, old age, obesity, renal failure, etc).

— Social conditions such as living alone and distant rural area living.

Treatment

— Obtain a haematocrit first.

— Give isotonic solution such as ringer Lactate or Normal Saline.

— Reasess, maintain temp, level of consciousness, pulse rate, urine output etc.

Group-C

When the patient have severe plasma leakage and fluid accumulates in different body cavities. Patient with severe haemerrhoges severe organ impairment.

— The critical period may be after 3-5 days of fever.

— The people may die also from dengue fever, if the patient develops DHF or DSS.

— With proper treatment patients with DHF and DSS can recover fully.

Treating doctors should be vigilant and monitor the patient 1-2 hours. Platelet counts and haematocrit need to be monitored repatedly to review the progress of the disease.

Platelet transfusion may be necessary if the patient suffers from DHS or Dengue Shock Syndrome with unstable vital signs . Give

— I.V. fluid with colloids

— Moist O_2 inhalation

— Blood transfusions

— Platelet transfusions

— Avoid diuretics

Both hypoglycaemia and hyperglycaemia can

occur in DHF patients and treatment with blood as and when necessary should be followed.

There are some people who suffer from Dengue, and may have no signs and symptoms.

One attack of Dengue do not confer immunity to further attacks as the patients may suffer from a different strain of virus.

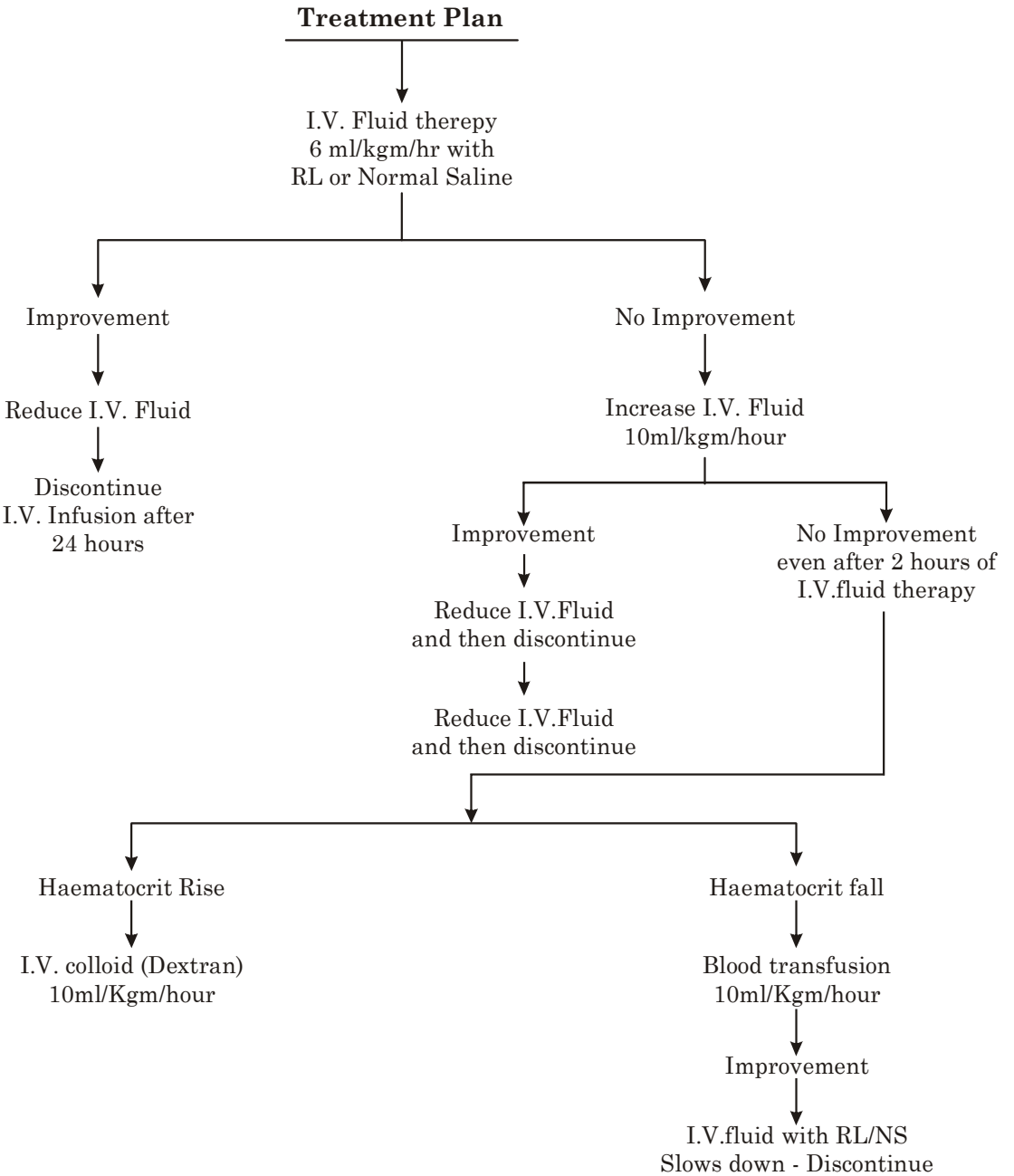

অস্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

সুমহান চক্রবর্তী, প্রাক্তন সম্পাদক, WBMSRU

১৩০ কোটি মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষে, বর্তমানে স্বাস্থ্যের চেহারাটা নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর, যাকে বলে একেবারে হাড় জিড়জিড়ে। একটা সময় ছিল, যখন দেশের মানুষের কথা কিছুটা ভেবে, কিছু পরিকল্পনা ভাবা হয়েছিল, যদিও তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল এবং তা পুরোপুরি কোনও দিনই বাস্তবায়িত হয় নি। তবু, দায় সারা হলেও, রাষ্ট্রের দায় ছিল দেশের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার। আজ সারা পৃথিবীর অর্থ পরিস্থিতির সাথে তাল মেলাতে, স্বাস্থ্যকে পণ্য করে তোলার বেপরোয়া সরকারি প্রচেষ্টা চলছে বেশ কয়েক বছর ধরেই। আর তাতে সাফল্যও এসেছে সরকারের ঝুড়িতে। যার নীট ফল দাঁড়িয়েছে, গোটা বিশ্বের সাথে তুলনামূলক প্রোগ্রেস রিপোর্ট (প্রগতি পত্র) অনুযায়ী, ভারতবর্ষের মানুষের স্বাস্থ্যমানের ধারাবাহিক অভূতপূর্ব অবনমন।

সারা বিশ্বের ১৯০টি দেশের মধ্যে, স্বাস্থ্য মানের ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষের স্থান দাঁড়িয়েছে ১১২ নম্বরে। যতই ঝাঁ চকচকে কর্পোরেট হাসপাতাল শহরগুলোকে গিলে ফেলুক না কেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রসবকালীন মৃত্যুর সংখ্যা সব চাইতে বেশী। এ দেশে, ১০০০০০ জন মানুষ পিছু, চিকিৎসক ৬০ জন (পাশকরা এ্যালোপ্যাথ), নার্স ১৩০ জন আর হাসপাতালের শয্যা ৯০টি।

তবুও আমাদের ধেশে স্বাস্থ্যখাতে রাষ্ট্রের খরচ, জি.ডি.পি.'র মাত্র ১.২ শতাংশ। যেখানে বিশ্বের গড় ৫.৬ শতাংশ। স্বাস্থ্য কিনতে আমাদের দেশের মানুষের পকেট থেকে খরচ বিশাল। একে তো সরকারি স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে, বাড়ছে বেসরকারি ক্ষেত্রের খরচও, তবে এ পোড়ার দেশে সাধারণ মানুষ যাবেটা কোথায় অসুখ-বিসুখ হলে? গরীব আর নিম্নবিত্ত মানুষ যারা ১৩০ কোটির ৭০-৭৫ শতাংশ, তাদের জন্য মাথা ব্যথা করে লাভ কি? স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের নজর এ দেশের ৩০ কোটি মানুষের বাজারের দিকে। সরকারেরও এ বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই। অসুস্থ মানুষকে সুস্থ হতে হলে প্রয়োজন – চিকিৎসক, চিকিৎসা আর ওষুধ। চিকিৎসক আর চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা আর সরকারি ঔদাসীণ্যের চেহারাটা তো সবার জানা, এ বার আসা যাক ওষুধের কথায় –

সাধারণতঃ আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যখন বাড়ে আমরা টের পাই। চাল-ডাল, তেল-নুন, তরি-তরকারী সব ক্ষেত্রেই। কিন্তু ওষুধের দাম বাড়ে সবার অলক্ষ্যে। ওষুধ এমন একটা জিনিস যা কিনতে হয় আমাদের নিতান্ত বাধ্য হয়েই। অন্যান্য জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে, যেমন পাঁচ দোকান ঘুরে দর-দস্তুর করে কেনা যায়, ওষুধের বেলায় তার ব্যতিক্রম। প্যাকেটের ওপর ছাপানো দামটাই মেটাতে হয় আমাদের।

পরিসংখ্যান বলছে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ ওষুধ খায় রোগ সারাতে, প্রতিষেধক হিসাবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে বা উন্নত রাখতে। আর গরীব মানুষ ওষুধ কেনে নিতান্ত বাধ্য হয়ে জীবন রক্ষার তাগিদে। তথ্য বলছে ভারতবর্ষের গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততার অন্যতম কারণ হলো চিকিৎসা, আর চিকিৎসার মোট খরচের ৭০ শতাংশ হলো ওষুধ কেনার, বাকীটা আনুসঙ্গিক।

ওষুধের দাম সহ চিকিৎসার ব্যয় বেড়ে যাবার জন্য প্রতি বছর ৩.৯ কোটি মানুষ চিকিৎসা করাতে গিয়ে দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যাচ্ছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক – এ রাজ্যে এক জন অদক্ষ শ্রমিকের সরকার নির্ধারিত দৈনিক রোজগার ২১৩ টাকা (২০১৭ সালে; রাজ্য সরকার নির্ধারিত) প্রতিদিন; তার চিকিৎসার খরচ –

রোগের ওষুধ	সময়	ন্যূনতম খরচ
টি.বি.	২৭ মাসের জন্য	৭৬ দিনের আয়
রক্তাল্পতা	৬ মাসের জন্য	১৪ দিনের আয়
উচ্চ রক্তচাপ	বছরে	৬৫ দিনের আয়
ডায়াবেটেস	বছরে	৭৮ দিনের আয়
জলাতংকের টিকা		৩৫ দিনের আয়

যদিও উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটেস ইত্যাদি গরীব মানুষের খুব

বেশী দেখা যায় না তবে একথা ঠিক ওষুধ কিনতে গিয়ে আমরা সব্বাই নাজেহাল, কেন এ অবস্থা?

প্রাক স্বাধীনতার সময় থেকেই এদেশের ওষুধের বাজারের একচেটিয়া দখল ছিল বহুজাতিকদের। বিদেশের চাইতে কম খরচে এদেশে উৎপাদিত ওষুধ বিক্রি করে বিশাল মুনাফা করতো এরা। স্বাধীনতা-উত্তর কালে চেহারাটা পাল্টে যায়, তৈরী হয় রাষ্ট্রায়ত্ব ওষুধ সংস্থা আই.ডি.পি.এল. (সোভিয়েত সহযোগিতায়), হিন্দুস্থান এ্যান্টিবায়োটিকের মতো সংস্থা, অধিগৃহীত হলো দেশের প্রথম ওষুধ সংস্থা বেঙ্গল কেমিক্যাল, এছাড়াও গড়ে উঠেছিল বহু রাষ্ট্রায়ত্ব ওষুধ সংস্থা। যারা অত্যন্ত কম দামে প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছে দিত সাধারণ মানুষের কাছে। পাশাপাশি ১৯৭০ সালের ভারতীয় পেটেন্ট আইনের সুবাদে – এদেশে তৈরী হতে শুরু হলো সমস্ত বিদেশী পেটেন্ট' ওষুধ , ''রিভার্স টেকনোলজিতে'' – ফলে গড়ে উঠেছিল অজস্র দেশী ওষুধ সংস্থা যারা অত্যন্ত কম দামে সমস্ত পেটেন্টড ওষুধই তৈরী করতো। সাথে সাথে সাংসদ জয় সুখলাল হাতি'র নেতৃত্বে গঠিত 'হাতি কমিটি'র সুপারিশে, প্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল এ দেশের স্বয়ম্ভর ওষুধ শিল্প যা দেশের দরিদ্র মানুষের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশের বিরাট বাজার দখল করেছিল। যার ওপর ভিত্তি করেই আজ দেশের ওষুধের অভ্যন্তরীণ ওষুধের বাজার ৯৭ হাজার কোটি টাকার ও বিদেশে রপ্তানীর বাজার ১লক্ষ ৪ হাজার কোটি টাকার।

সারা পৃথিবী যখন আর্থিক মন্দায় আক্রান্ত, বাজার যখন সংকুচিত হচ্ছে তখনও ভারতবর্ষের বাজারে মন্দার ছাপ পড়েনি, তাই এর চেয়ে লোভনীয় বাজার বহুজাতিকদের আর কি হতে পারে? সরকারের বেল-আউট প্যাকেজ নিয়ে বহুজাতিক ওষুধ সংস্থাগুলির লক্ষ্য হযে দাঁড়ায় ভারতবর্ষ। আর বাজার দখল করতে, প্রতিযোগীহীন করতে, এ দেশের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি চলে রাজনৈতিক স্তরে। উন্নত দেশগুলির সেই চাপের কাছে গত কয়েকবছরে নতি স্বীকার করে পরিবর্তিত হয়েছে আইন, 'ease of doing business' এর নামে, তুলে দেওয়া হয়েছে বিদেশী সংস্থাগুলির প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কম দামে ওষুধ তৈরী করার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলি, অবাধ বাণিজ্যের নামে ওষুধ শিল্পে ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ আর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার লঘুকরণ। যার ফলে ওষুধ আজ অধরা – সাধারণ মানুষের কাছে। এবার দেখা যাক কি কি ঘটছে আর তার পরিণতি কি?

মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ:

আমাদের দেশে ওষুধের মূল্য নির্ধারণের জন্য ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি নামে এক স্ব-শাসিত সরকারি সংস্থা আছে, যারা বাজারে কত দামে কোন ওষুধ বিক্রি হবে তা ঠিক করে দেয়। এই সংস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে প্রায় সব ওষুধই বাজারে বিক্রি হয় ''নির্ধারিত মূল্যে'' চেয়ে বেশী দামে চোখের সামনেই, এক্ষেত্রে ওই সংস্থা শুধু কাগুজে বাঘ। কয়েকটা উদাহরণ–

ওষুধ	নির্ধারিত দাম (টাকা/ট্যাবলেট)	বিক্রি হচ্ছে (টাকা/ট্যাবলেট)
এ্যামলোডিপিন - ৫ মিঃগ্রাঃ	৩.১০	৮.৬০
এ্যাটেনোলল - ৫০ মিঃগ্রাঃ	২.২৮	৩.৮০
লোসারটন - ৫০ মিঃগ্রাঃ	৪.৭৫	৯.৩৮
এ্যাটরভাস্টিটিন - ১০ মিঃগ্রাঃ	৬.৭৪	১০.৪৫
মেটফরফিন - ৫০০ মিঃগ্রাঃ	১.৭২	২.০০
ট্রামাডল - ৫০ মিঃগ্রাঃ	৬.৬৬	৯.১৫
ট্রামাডল ইঞ্জেকশন	১২.৯৫/ভায়েল	১৮.৯০
প্রেডনিসোলোন - ৪০ মিঃগ্রাঃ	৩.০৭	৫.১২

বাজারে বিক্রি হওয়া সমস্ত ওষুধেরই মূল্য নির্ধরিত, তবে সব ওষুধের মূল্যই নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রয়োজনের ভিত্তিতে ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডারের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ:

আরও একটা বড় ফাঁকি। মূল্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এমন সব ওষুধ যা হয় অচল অথবা যার বিকল্প রয়েছে। যেমন ধরুন মূল্য নিয়ন্ত্রিত হলো সেটিরিজিনের, ফলে এখন সব ওষুধ কোম্পানীই সেটিরিজিনের বদলে নিয়ে এলো তার সমতুল লিভো-সেটিরিজিন, কাজ এক, গুণাগুণ সমধর্মী শুধু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল দাম। এ্যামব্রোকসল-সালবুটামল যুক্ত কাশির ওষুধ নিয়ন্ত্রিত মূল্য হল ১৪ টাকা, সব কোম্পানী সালবুটামলের বদলে নিয়ে এল লিভো-সালবুটামল, ফলে ১৪টাকার ফাইলের দাম দাঁড়ালো ৫৯টাকা।

এছাড়া নিয়ন্ত্রিত মূল্য নির্ধারণের ফর্মুলাতেও গলদ। উৎপাদনের খরচের বদলে বাজারে ওই ওষুধের সবচেয়ে বেশী বিক্রি ব্র্যাণ্ডগুলির দামের গড় নিয়ন্ত্রিত মূল্য ঘোষণা করা হচ্ছে। অথচ কম দামে পাওয়া ওই ব্র্যাণ্ডগুলির দাম গ্রাহ্য হল না, গ্রাহ্য হল না উৎপাদনের খরচ কত। ফলে, নিয়ন্ত্রিত দামও যথাযথ হলো না। এর চেয়ে কম দামে বাজারে যে ওই মৌলের ওষুধ ছিল তার দামও বাড়লো। পাশাপাশি, নিয়ন্ত্রিত মূল্যের ওষুধগুলির দাম প্রতি বছর ১০ শতাংশ বাড়ানোর আগাম অনুমতি দেওয়া থাকলো, কারো যদি মাসে ১০০ টাকার ওষুধ কিনতে হয়, বছরে ১২০০০ টাকা, পরের বছর ১৩২০০ টাকা, তারপরের বছরে ১৪৫২০ টাকা আর তিন বছরে তা হবে প্রায় ১৬০০০ টাকা। কত শতাংশ দাম বাড়লো? ৩৩ শতাংশ। এই হলো মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফাঁকি। সম্প্রতি সরকার কিছু ব্র্যাণ্ডকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় এনেছে বলে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার চলছে।প্রশ্ন হলো কিছু ব্র্যাণ্ডকে কেন? কেন ওই ব্র্যাণ্ডের মৌলকে নয়? তবে কি কোনো বিশেষ কর্পোরেট সংস্থাকে সুবিধে পাইয়ে দিতে, বাজারকে প্রতিযোগিতাহীন করে, কোনো সংস্থার ব্র্যাণ্ডকে একচেটিয়া বাজার দখলের সুযোগ করে দিতে?

দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলনের চাপে ও আদালতের নির্দেশে গত ১৪ই জানুয়ারী ২০১৭ সালে শুধুমাত্র কোরোনারী স্টেন্টকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে এসেছে সরকার। এই স্টেন্ট, পেস মেকার ইত্যাদির কোনো নির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য ছিল না। তা ছাপানোও নেই প্যাকেটের গায়ে আর নিয়ম থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন খরচ বা বিদেশ থেকে আমদানীর খরচও জানানো হয় না সরকারকে। শুধু পেস মেকার, স্টেন্ট নয়, বেশীরভাগ চিকিৎসা সরঞ্জামের ক্ষেত্রেই তাই। এখনও রোগীরা ঠকছেন বহুগুণ বেশী দামে এসব কিনতে। সরকারের কোনো হেলদোল নেই।

এর ওপর আবার জি.এস.টি.–

আমাদের দেশে, পেট্রোপণ্যের পর সবচেয়ে বেশী অর্থ কোষাগারে জমা হয় ওষুধের শুল্ক ও কর বাবদ। বর্তমানে জি.এস.টি. বা পূর্বতন ভ্যাট নেওয়া হয় বিক্রয় মূল্যের ওপর, উৎপাদনের খরচের ওপর নয়। ফলে খরচ বাড়ে ওষুধ কেনায়। আর ওষুধ তো শখের জিনিস নয় যে ইচ্ছে হলে কিনবে, তবে ওষুধের ওপর কর থাকবে কেন? ওষুধের ওপর গত ১লা জুলাই থেকে অভিন্ন পণ্য পরিষেবা কর বসেছে, ক্যাটাগরি ভিত্তিক ৫শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৮ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ। আমাদের দেশের বাজারে বিক্রিত ৭০ শতাংশ ওষুধই ১২ শতাংশ জি.এস.টি.'র আওতায়। আগে শুল্ক ও কর নিয়ে দিতে হতো যেখানে ৮.৯ শতাংশ এখন তা লাগছে ১২ বা ১৮ শতাংশ। ফলে আবার দাম বাড়লো ওষুধের। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ঘোষণাকে উড়িয়ে দিয়ে দাম বেড়েছে ৩-৯ শতাংশ। এর ওপর আবার দোকান থেকে শ'খানেক টাকার ওষুধ কিনলে যে ছাড় দিতো দোকানী, ১০-১৫ শতাংশ, তাও বন্ধ। মানে ফল দাঁড়ালো আগে ১০০ টাকার ওষুধ কিনতে খরচ হতো ৯০ টাকার মতো, এখন ১১৩ টাকা থেকে ১২৫ টাকা।

ওষুধ শিল্পে বিদেশী পুঁজি

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি ক্ষেত্রের সাথে ওষুধ শিল্পে ১৮০ শতাংশ বিদেশী পুঁজি অনুমোদন করেছে। এ দেশে ওষুধ তৈরীর খরচ আমেরিকা বা ইউরোপের চেয়ে ৫০ শতাংশ কম। তাই শুরু হয়ে গেছে দেশীয় সংস্থা অধিগ্রহণ। বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলি একের পর এক ব্রাউনফিল্ড ইনভেস্টমেন্ট করে চলেছে এ দেশে। তৈরী বাজার, তৈরী পরিকাঠামো কিনে নিয়ে। ইতি মধ্যে রাজনৈতিক চাপ দেওয়া হচ্ছে দেশের ওপর যাতে বিদেশের পেটেন্ট করা ওষুধ, ভারতবর্ষে নিজস্ব ব্যবস্থায় তৈরী করার যে আইন ছিল কম্পালসারি লাইসেন্সিং তা বন্ধ করে দেবার জন্য। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন সফরে গিয়ে বহুজাতিক ওষুধ লবিকে আশ্বস্ত করেছেন এ বিষয়ে। তা যদি হয় তা হলে আমাদের দেশীয় কোম্পানীগুলি আর রক্তের ক্যান্সারের ওষুধ ''ইমাটিনিব'' (মাসে রোগীর খরচ ৬-৭ হাজার টাকা) তৈরী করতে পারবে না, কিনতে হবে বহুজাতিকের পেটেন্টড ওষুধ গ্লীভাক, যার খরচ প্রতি মাসে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, তেমনি কিডনী বা লিভার ক্যান্সারের ওষুধ ''সোরাফেনিব'' মাসে ৮ হাজার টাকার বদলে কিনতে হবে বহুজাতিকের পেটেন্টড ওষুধ ''নেক্সভার'' যার মাসে খরচ ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

অনেকে বলেন কম দামে মানুষকে ওষুধ পৌঁছে দিতে হলে ''জেনেরিক''ই একমাত্র বিকল্প।

কথা হলো, বিদেশে দু'রকমের ওষুধ পেটেন্টড আর পেটেন্ট ফুরিয়ে গেলে তাকে বলে জেনেরিক তা বিক্রি হয় ব্র্যাণ্ড নামেই। আমাদেরে দেশে আমরা মৌলের নামকেই জেনেরিক বলি। বাজারে – আমাদের ভাষায় যে জেনেরিক তা হল ব্র্যাণ্ডেড জেনেরিক। তার উৎপাদন খরচ খুব কম তবে বহু ক্ষেত্রেই, বিক্রয় মূল্য ব্র্যাণ্ডেড ওষুধের চেয়ে বেশী, বর্তমানে এ রাজ্যে সরকারি হাসপাতালেও এই ব্র্যাণ্ডেড জেনেরিকই চলছে।

ধরে নেওয়া যাক মৌলের নামেই ওষুধ বাজারে এলো, ডাক্তারবাবু প্যারাসিটামল লিখলেন, কোন কোম্পানীর প্যারাসিটামল, তা ঠিক করবে কেমিষ্ট। যে প্যারাসিটামলে তার লাভ সবচেয়ে বেশী, তাই বিক্রি হবে। চিকিৎসকের, রোগীর প্রতি যে দায়বদ্ধতা তা প্রতিফলিত হবে না ওষুধের দোকানে, ফলে, চিকিৎসার একটা অংশ চলে যাবে তাদের হাতে, যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত নয়।

সব মিলিয়ে চলছে একটা চূড়ান্ত অব্যবস্থা। আর এর জন্য লাভবান হচ্ছে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট যাদের হাতে দেশের ১৩০ কোটি মানুষের ৩০ কোটিকে সুস্থ ভাবে যে কোনো মূল্যে বাঁচিয়ে রাখার বরাৎ দিয়েছে আমাদের রাষ্ট্র, আর বাকী ১০০ কোটি? চুলোয় যাক এই গরীব-গুর্বোরা। এর বদল সম্ভব। স্বাস্থ্য খাতে আরও বেশী বরাদ্দ, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, পর্যাপ্ত চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীর সাথে সাথে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের ওপর থেকে সমস্ত জি.এস.টি. প্রত্যাহার সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় ওষুধকে উৎপাদন ব্যয় ভিত্তিক মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ওষুধ সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন ও কম্পালসারি লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বহাল রাখার দাবী নিয়ে দেশব্যাপী সমস্ত শ্রেণীর মানুষজনকে নিয়ে একটা অনুরণন গড়ে তোলা। অতীতে এভাবেই কোরোনারী স্টেন্টকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের আওতায় আনা গেছে। কমানো গিয়েছিল বিক্রয়কর, বন্ধ করা গেছে বহু বিপজ্জনক ওষুধের বিক্রি। এর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে, চিকিৎসক, স্বাস্থ্য-কর্মী সহ ওষুধ বিপনন শিল্পের প্রতিনিধি ও নাগরিকদের।

৩৪ বছরের কাটাছেঁড়া

ডাঃ অমিত পান, সাধারণ সম্পাদক, ডক্টরস্ ফর ডেমোক্রেসি

ইদানীংকালে, বিভিন্ন সংগঠনের সভায়, একটা কথা প্রায়ই শুনতে হচ্ছে – গত ৩৪ বছরের অত্যাচার ও গণতন্ত্রের উপর আক্রমণের কথা; অনেকেরই বোধহয় ধারণা নেই কোনটা বেশী খারাপ, ৩৪ না ৭।

সত্যিই কি ৩৪ এত খারাপ ছিল যে তার আগের ৭২ থেকে ৭৭কেও ভুলিয়ে দিল? আরও সমস্যা যে ৩৪-এর সমর্থকরা বোধহয় নিশ্চিত নয় এই সময়ে সত্যিই সদর্থক কিছু ছিল কিনা এবং থাকলে সেটা কী। শুধুমাত্র সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্তিগত ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ তো এর উত্তর হতে পারে না। ভোটের সময়ও দেখেছি একদম উড়িয়ে দিতে ৩৪ বছরে কিছুই হয়নি বলে – তবে এটা বলা খুব সোজা। কিছু হয়নি বলার জন্যে তো কিছু জানতে হয় না।

৩৪ বছরের সদর্থক দিক অবশ্যই কিছু আছে। সম্প্রতি একজন নকশাল নেতা সন্তোষ রাণার "রাজনীতি - এক জীবন" বইটিতে তিনি লিখেছেন, ছাত্রাবস্থায় তাঁর গ্রামে (গোপীবল্লভপুর অঞ্চল) গ্রামীণ সভা (বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নয়) পুরোটাই পরিচালিত হত বৃহৎ ভূস্বামী বা উচ্চবর্ণের লোকেদের দ্বারা। কেবল বাগদি-মালো-মাঝি প্রভৃতি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ই নয়, সামগ্রিকভাবে গরীব মানুষের ভূমিকাই ছিল নগন্য। শ্রী রাণার বক্তব্য অনুযায়ীই ১৯৭৭ এর পরে এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। যাদের কথা কোনদিন শোনা হত কিনা সন্দেহ - তারাই বলিষ্ঠভাবে নিজেদের অবস্থান ও ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করতে শেখে। সামাজিক অধিকারবোধ ও নিজের আত্মমর্যাদাবোধ সম্বন্ধে সচেতন হওয়াটা কিন্তু খুব সামান্য কথা নয়। আজকাল প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নিজের কথা অনায়াসেই বলতে পারে; এই আত্মবিশ্বাস অর্জনে ৩৪ বছরের ভূমিকা অস্বীকার করার জায়গা নেই। পিছিয়ে থাকা মানুষদের লড়াইতে এই বিশ্বাস যোগানো অবশ্যই এক সার্থক পদক্ষেপ। ওই একই বইতে খাসজমি উদ্ধার ও বর্গাদারের নাম নথিবুক্ত করার ক্ষেত্রে অপারেশন বর্গার অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। নতুন সরকারের আমলে , নতুন নিয়মে, চাষীকে যেতে হয় না জে.এল.আর.ও. অফিসে, পরিবর্তে সরাসরি জমিতে সর্বসমক্ষে মাপজোপ করে, সকলের মৌখিক সাক্ষ্য আর লিখিত দলিলের ভিত্তিতে ওইখানেই বর্গাদারের অধিকার কায়েম করা ও একইসাথে খাসজমি চিহ্নিত করা – আক্ষরিক অর্থেই এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। একই সঙ্গে ব্যাপক ভূমি সংস্কারের সুফল লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক, যারা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি তারা জমির মালিক হতে পারবে, তারা কয়েক কাঠা করে হলেও জমির মালিকানা পেল। সব মিলিয়ে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় বহুযুগ ধরে থাকা এক শ্রেণীর কায়েমী ক্ষমতার আস্ফালনের মূলে আঘাত বলা যেতেই পারে।

বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন – এত ছোট ছোট জমিতে চাষ করলে সামগ্রিক বিচারে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেই পন্ডিতদের ভুল প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে এবং চাল উৎপাদনে এই প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। দু'টাকা কেজি চাল দেবার ব্যবস্থা না থাকলেও এই প্রথম গরীব চাষীর সম্বৎসর দু'বেলা ভাতের সংস্থান হয়। ফলতঃ গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অনেকটাই বাড়ে। এর সুফলটা সারা রাজ্যই পেল। আর হ্যাঁ, আমরা চিকিৎসকরাও কিন্তু তার মধ্যে পড়ি। ৭৭ সালের আগে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের উপার্জন আর তার ১০-১৫ বছর পরের উপার্জন (মূল্যবৃদ্ধির সূচক ধরে নিয়েই বলছি), একবার মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন – কোনো তুলনাই চলে না।

যে সার্বিক উন্নতির দামামা আজকাল প্রায় প্রতিদিন বাজছে উচ্চরবে, তার বেশীরভাগের সূচনাই হয়েছিল আগের ৩৪ বছরে। গ্রামীণ স্তরে যোগাযোগের সুব্যবস্থা - সড়ক নির্মাণ ও তার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি, প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ এবং শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর উন্নত পুনর্বিন্যাস, এই সবই তো বিগত ৩৪ বছরের অবদান। অনেক প্রতকূলতা জয় করে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করায় বিদ্যুৎ

উৎপাদন বৃদ্ধির কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সুদূরপ্রসারী এর ফল, সেই ফল তো ভোগ করছে পরবর্তী শাসকগোষ্ঠী।

আর নতুনভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির প্রথম ধাপ। ৩৪ বছরেই তো হয়েছিল।

তাহলে কি খারাপ কিছু ছিল না – অবশ্যই ছিল।

১। প্রথমেই আসবে – গণআন্দোলন, গণউদ্দীপনা, সমাজ পরিবর্তনের জন্যে যে অভূতপূর্ব আকুতি জরুরী অবস্থার পরের অধ্যায়ে দেখা গেল তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ব্যর্থতা। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে যে ব্যাপক গণজাগরণ আনার সুযোগ ছিল তাকে সত্যিই সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় নি। ইতিহাস বারবার সুযোগ দেয় না, তাই ''জীবনে পরমলগন''কে হেলা করলে ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। প্রায়ত বামপন্থী নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত বলতেন, ''কমরেড, দেখবেন যেন শুনতে না হয় বিপ্লবের ট্রেন চলে গেল – আমি ধরতে পারিনি''। বিপ্লবের ট্রেনের সময় সারণি জানা নেই – কিন্তু ১০-১৫ বছরের পর নির্বাচন-তরণী ছাড়া কোনও যানবাহন ধরারই তাড়া ছিল বলে মনে হয় না।

২। জাতিগত বঞ্চনা, আদিবাসীদের অধিকার ও স্বনির্ভরতা, বিভিন্ন জনজাতির ভাষা-সংস্কৃতি-লোকাচার-ধর্ম ও সংখ্যাগত ভাবে তাদের পৃথক ও বিশেষ অবস্থান – এ সমস্ত বিষয়ে যে গভীর ও বিস্তারিত অনুসন্ধান আর তথ্য সংগ্রহ দরকার ছিল সে বিষয়ে উদ্যম ছিল নগণ্য। মন্ডল কমিশনের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্ট ছিল, এ রাজ্যে কোনো পশ্চাদপদ জাতি নেই। কমিশনের তথ্যে তা নথিভুক্ত আছে।

৩। সর্বক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ – মানুষ এর ফলে যত না রাজনীতি সচেতন হয়েছে তার চেয়ে বেশী হয়েছে পার্টি সচেতন। আর অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি বিমুখ। যার বিষময় ফল এখন দেখা যাচ্ছে। আই.এম.এ.তে বর্তমান সময়ের মত সর্বাঙ্গীণ দখল না থাকলেও, আই.এম.এ., মেডিক্যাল কাউন্সিল (রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় দু'জায়গাতেই) কমিটি বা প্রতিনিধি নির্বাচনে রাজনৈতিক আনুগত্যই বিশেষভাবে বিবেচ্য ছিল।

৪। প্রশাসনকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিয়মানুগ করায় ব্যার্থতা – আজ যখন সমস্ত ক্ষেত্রে কোনও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে যা খুশি চলছে, তখন প্রশ্ন করলেই কিছু লোক বলে ওঠে ৩৪ বছরেও এমনটাই হত। এই কথা বলার সুযোগ, দুঃখজনক হলেও সত্যি, তারা পেয়েছে।

সবচেয়ে বেশী করে এই সমস্যায় পড়তে হয় সরকারি ডাক্তারদের। এটা তো অনস্বীকার্য, বর্তমান অবস্থার সাথে কোন তুলনা না হলেও আগের আমলেও বদলিনীতি নিয়ন্ত্রণ করত কিছু ব্যক্তি। প্রকৃত স্বচ্ছ বদলিনীতি কি সত্যিই কোনদিন রূপায়িত হয়েছে? কী ভেবেছিলেন নেতৃত্ব – পুরোনো জামানা চিরকাল থাকবে? যেমন ভাবছেন আজকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রকরা? সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠনকেও ভাবতে হবে – বদলিনীতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে কোন্ স্বাস্থ্য আন্দোলনকে তারা কীভাবে শক্তিশালী করেছেন।

অবশ্য এটাও ঠিক, যারা আজ নিজেদের বঞ্চিত বা অত্যাচারিত বলে বেশী চিৎকার করছে তাদের বেশীরভাগই কিন্তু গত জামানায় ভালভাবেই উপকৃত ও সংরক্ষিত ছিল।

আর সবচাইতে গভীর ও বিপজ্জনক সমস্যা হল প্রভুত্ববাদ।এখানে অবশ্য সত্যিই একটা সমস্যা আছে। ভারতের পুরোনো ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে – লিচ্ছবি-মল্ল-শাক্য ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচন এবং শাসনপদ্ধতির অস্তিত্ব পাওয়া যায় বটে কিন্তু সার্বিকভাবে প্রকট হয়ে ওঠে সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দমন করে বর্ণ-ধর্ম-জাতি-অর্থ ও ক্ষমতার প্রভুত্ববাদ। বস্তুতঃ তা আমাদের মনে এত গভীরে ঢুকেছে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও নেতৃত্বও অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সাংগঠনিক স্তরে এর থেকে মুক্ত তো নয়ই বরং একান্তভাবে অভ্যস্ত। প্রভুত্ব ও বশ্যতা এই দুই বিষম অথচ পরিপূরক বস্তুকে যদি কোনদিন সমূলে বিনাশ করা যায় তাহলেই ভবিষ্যতের জন্যে আশা রাখা যাবে, নতুবা নয়।

আমিত্ব

ডাঃ রেজাউল করিম, সভাপতি, WBDF

পিটার সেলারস্‌কে উদ্ধৃত করেছেন অমর্ত্য সেন তাঁর "Country of first boys" বইটিতে। ''একসময় আমার 'আমিত্ব' ছিল। অস্ত্রপচার করে আমি তাকে বাদ দিয়েছি''। মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয় তার আমিত্বকে নির্মাণ করে। সে দেশকালাতীত চিন্তা-চেতনা শরিক হলেও তার খণ্ডিত গৌন পরিচয় তার ওপর আমিত্ব আরোপ করে। সেই 'আমি' দুর্বিনীত হতে পারে, সুশীল হতে পারে – কিন্তু সেই নতুন পরিচয় তার চরিত্রের দৌতক হয়ে দাঁড়ায়। বিভূতিবাবুর গল্পে পড়েছিলাম – ঝড় জলের রাতে এক ডাক্তার রুগী দেখতে যাচ্ছেন। হাতে ভারী ব্যাগ। কাদার রাস্তায় অনভ্যস্ত ডাক্তার যখন খাবি খাচ্ছে তখন একটা লোকের সাথে দেখা। ডাক্তার বললেন – ওরে আমার ব্যাগটা নিয়ে চলতো বাপু। একটা সিরিয়াস ক্যাস দেখতে যাচ্ছি। লোকটি ব্যাগ নিয়ে ডাক্তারকে রোগীর বাড়ি নিয়ে গেল, নিজে ঠাঙ্গাড়েদের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। পরে জানা গেল সে আসলে ঠ্যাঙ্গাড়েদের দলপতি। কিন্তু তার আরোপিত ভালো 'আমি'কে অস্বীকার করে, তার স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জয় করে অন্যতর মহীমায় উন্নীত হচ্ছে। মরা মরা বলতে বলতে রত্নাকর যেমন বাল্মীকিতে উন্নীত হয়েছেন।

প্রশ্ন হলো – সর্বগ্রাসী আরোপিত আমিত্ব নিয়ে। আমার মস্তিষ্ক প্রখর, আপনি তুল্যমূল্য বিচার করে ভালোকে ভালো বলেন, আপনি নিজেকে বৃহত্তর সমাজের অংশ ভাবেন – কিন্তু এইসব কিছুই গৌন হয়ে যেতে পারে যদি সমাজ কোন সাধারণ সূত্র দিয়ে আপনার পরিচিতিটি কোন বিশেষ একমাত্রিকতায় আবদ্ধ করে ফেলেন। সেই গল্পটি মনে আছে – একটা লোক নিজেকে মুর্গি ভেবে শেয়ালের ভয়ে লুকিয়ে থাকতো। চিকিৎসায় সেরে ওঠার পর যখন সে বাড়ি ফিরছে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলো – ডাক্তারবাবু, আমি জানি আমি মুর্গি নই। শেয়ালগুলো কী জানে?

আমাদের দৈনন্দিনতায় আমরা জীবনের সব বন পরিচয়কে হারাতে বসেছি। ধর্মীয় বাহ্যিজ একমাত্রিক পরিচয়কেই সবচেয়ে বড় পরিচয় বলে ভাবতে শিখেছি। এই প্রাণঘাতী গরমেও আপাতমস্তক কাপড়ে ঢাকা একজন মহিলাকে বললাম – এই গরমে কেন এত পোষাক পরেছেন? আসলে তো শালীনতা রক্ষা করাই পোষাকের উদ্দেশ্য, তাহলে যে কোন শালীন রুচিসম্মত দেশকালে গ্রহণযোগ্য পোষাক কেন পরেন না? তিনি বললেন – ''না গো বাছা। আমি আরব দেশে তীর্থ করে এসেছি।'' তাঁর এখন নতুন পরিচিতিকে রক্ষা করতে হবে। সব পরিচয় আসলে একটা সংস্কার। সেই সংস্কারের উর্দ্ধে ওঠার জন্য সামাজিক পরিবেশটি সহজ, অবাধ ও নিরাপদ হতে হবে।

হিন্দুধর্ম নিজেই বহুমাত্রিক। আপনি নিরাকারে বিশ্বাসী – আপনি হিন্দু হতে পারেন। আপনি ভক্ত। আপনি আকারকে পূজো করতে পারেন। আপনি চার্বাকচেলা – আপনি কোন ধর্মের ধার ধারেন না। কিন্তু হিন্দু আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবে। এই উদার হিন্দু সারা পৃথিবীতে পরিচিত। বাঙালী আবার তার চেয়েও সরেস। সে অবলিলায় ময়ূরবাহন কার্তীকেওর বদলে ময়ূরকে পূজো করতে পারে, লক্ষ্মীর বদলে লক্ষ্মীর বাহনে তার অরুচি নেই, সঙ্কটমোচনের জন্য বিঘ্নবিনাশীর দেখা না পেলে তার বাহনের তার সমান প্রতীতি। প্রাচীন বাংলা কৌম সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় পরিচয়ের বর্ণনা আমরা আকর গ্রন্থে পাই যেখানে ধ্বজাপূজোও করা হত। সদুক্তিকর্নামৃতে লেখা আছে – ''বর্বর গ্রমীণ নানা জীব বলি দিয়ে পাথরের পূজো করে, রক্ত দিয়ে কান্তারদেবের পূজো করে, গাছতলায় ক্ষেত্রপালের পূজো করে এবং দিনের শেষে যুবতী সহচারীদের নিয়ে তুনী বাজিয়ে বেলের খোলায় মদ্যপান করে।'' জীবনকে বহুমুখে বিস্তৃত করে, তার ব্যাপকতাকে অনুভব করে নিশ্চিত জীবনই বাঙালীর আদি জীবনচর্যার নির্যাস। মুসলমান বাঙালীর সামনে আছে তার আদিম কৌম সংস্কৃতি যার হদিশ পেয়ে রস গ্রহণ করতে পারলে তার পাঁচসহস্রব্যাপী চর্চিত অভ্যাস যা তার শোনিতধারায় প্রবাহিত তাকে আবিষ্কার করতে পারে। ধর্মের গোঁড়ামির সংঘবদ্ধ রূপ দেখেছে তথাগতের হাত ধরে। দিনেশচন্দ্র লিখেছেন – এই বৃহৎ

বঙ্গে এমন কোন পল্লী ছিল না, যেখানে ভগবান তথাগতের নামে জয়ধ্বনি হত না। কিন্তু সেই সংঘের হাত ধরে গড়ে উঠেছিল জ্ঞানশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র – যা মুসলমান শাসনে প্রায় বিলীন হয়েছে।

ইসলামকে নবী কি করতে চেয়েছিলেন আর কি হয়েছে সেই বিতর্কের অবসান করা সম্ভব নয়। কিন্তু আদি ইসলামে যে নিয়ম সর্বস্ব ছিল না, তার অনেক প্রমাণ আছে। নিয়মের বেড়াজাল তৈরী হয়েছে – সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। মক্কা মদিনার মধ্যবর্তী একটা জায়গার নাম হল – মুহাম্মদ যেকানে বিকালের উপাসনা সন্ধ্যেবেলায় করেছিলেন। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম নামটি দেখে। এই তথ্যটি আদি ইসলামের যে রূপটি উন্মোচিত করে, তখনো ইসলাম তেমনভাবে সাম্রাজ্যবাদী হয় নি। পরিচিতির একীকরণ শুরু হয়েছে যখন সে দেশ-বিদেশে সোনার খনীর সন্ধার পেয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিটি ঘন্টা মিনিটে সে ঈশ্বরের কাছে বলি প্রদত্ত। সেই বলির হাড়িকাঠ থেকে বেরিয়ে নিজের অন্যতর পরিচিতি নির্মাণ তার পক্ষে অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল সুফি ভক্তিবাদ। চিত্তের শুদ্ধি করতে হবে তাহলে ফানাফিল্লাহ সম্ভব হবে। আল্লহকে ভয় নয়, ভক্তি করতে হবে। মহম্মদ আল্লহকে বলেছিলেন – রফিকে আলা – মহান বন্ধু। সুফি সেই মহান বন্ধুর সাহচর্যে নতুন পরিচিতি নির্মান করে।

পরিচয়ের সমস্ত স্তরের মূল লক্ষ্য নিজেকে মানুষ হিসেবে উন্নীত করা। মহত্বের পরীক্ষায় সে যেন কখনো ব্যার্থ না হয়। পরিচয়-সংকট থেকে মুসলমান বাঙালীর উত্তরণ কোন সহজ সমীকরণে হয়তো হবে না। নানা ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে তার অনন্য সত্বাকে আবিষ্কারই তার ভবিষ্যতের দিশারী হতে পারে।

কবির কথায় –

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;
পঙ্গু মূখ কবন্ধ বধির আধার
স্থুলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;
অনুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অতল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুশের বিদনার শূলে।

পরিচয়ের নির্মাণ করতে হলে আরোপিত আমিত্বে অস্ত্রপচার দরকার। ছটাক পরিমাণ ধর্ম কম পড়লেও মনুষ্যধর্ম রক্ষা হবে এ আমার গভীর বিশ্বাস ও উপলব্ধি।

Medical NEET - সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সাম্প্রতিক নির্দেশনামা ও আমাদের কিছু বক্তব্য–

ডাঃ তুহীন দত্ত

সম্প্রতি ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় Medical NEET কে নিয়ে দীর্ঘ প্রায় ৩ বছরের শুনানির পর যে আদেশনামা প্রকাশ করেছে তার মর্মবস্তু সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি এবং প্রাক- আদেশদান পর্বে কেন্দ্রীয় সরকার, MCI এবং CBSE গত ২৮শে এপ্রিল তাদের এ বিষয়ে সদর্থক হলফনামা ডিভিশন বেঞ্চে জমা করে – যা বিবেচনার মধ্যে এনেই সুপ্রিম কোর্ট তাঁর আদেশনামা ব্যাক্ত করে।

যে বিষয়গুলিতে বিভ্রান্তি ও দুর্বলতা আছে বলে আমাদের ভাবনা –

ক) বহুত্ববাদের ভারতবর্ষে CBSE, ICSE, রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ভিন্ন পাঠ্যক্রম বিভিন্ন রাজ্যে চালু আছে। ''অভিন্ন পাঠক্রম'' না থাকার পরিণতিতে এই NEET পরীক্ষায় যথেষ্ট মেধা সম্পন্ন হওয়া স্বত্বেও বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে অপারগ হবে।আমাদের দেশের Merit Based Education এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে এবং পরিকল্পিত ভাবে Theory of Exclusivity-এর ভ্রান্ত প্রয়োগ হবে।

এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য যে সারা ভারতে CBSE Board-এ পাঠরত ছাত্রসংখ্যা ৬ শতাংশের আশেপাশে। তাদের মুখ্য অবস্থানও শহর ও শহরতলীতে, গ্রামাঞ্চলে নেই বললেই চলে। তাই NEET চালু করতে গেলে সারা দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, Faculty Development Programme এর ব্যবস্থা এবং অভিন্ন পাঠক্রম-এর ব্যবস্থা করতে হবে যার জন্য পর্যাপ্ত সময় দরকার – এই অস্বাভাবিক দ্রুততা ছাত্রদের ভবিষ্যতকে আক্রান্ত করবে।

এ বিষয়ে আরও প্রণিধানযোগ্য যে, সমস্ত Board থেকে নির্বাচিত অংশ নিয়ে বিগত সময়ে NEET একটি সিলেবাস প্রকাশ করে – ছাত্রছাত্রীদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতির জন্য। কিন্তু এ বছর এরকম কোন সিলেবাস তাদের তরফে প্রকাশ করা হয় নি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক কাঠামোয় শিক্ষা যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয়।এক্ষেত্রে Regional Variation and State Specific Need Assessment-কে বিবেচনার মধ্যে এনেই পরীক্ষা পদ্ধতি নিরূপিত হওয়া উচিত। CBSE-এর সিলেবাসকে সর্বোৎকৃষ্ট ধরে গুণমানকে নিশ্চিত করাই একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে না; সেক্ষেত্রে চিকিৎসক হওয়ার পর স্থায়ী নিবন্ধীকরণের পূর্বে জাতীয় স্তরে Qualifying examination নেওয়ার কথাও বিকল্প হিসাবে ভাবা যেতে পারে।

খ। আমরা জানতে পেরেছি, মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় প্রশ্নপত্র প্রকাশ করা ছাড়াও ৭টি স্থানীয় ভাষা (এর মধ্যে বাংলাও আছে) বিবেচনার মধ্যে এনেছেন। এক্ষেত্রে দেশে স্বীকৃত সমস্ত Local Vernacular-কে যথোচিত গুরুতব দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

এ ব্যাপারেও ইংরাজী প্রশ্নপত্র থেকে স্থানীয় ভাষায় ভাষান্তর বা অনুবাদ করার সময় সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।নচেৎ প্রশ্নের বিষয় পরীক্ষার্থীর কাছে অন্যভাবে প্রতিভাত হয়ে সমস্যা তৈরী করবে।

গ। এখনও পর্যন্ত মেডিক্যাল আসন বন্টনের ক্ষেত্রে রাজ্যস্তরে ৮৫ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় কোটা থেকে ১৫ শতাংশ – এই প্রকারে বিন্যস্ত থাকে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা বর্ষে on line form fiil up-এর ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, প্রত্যেক পরীক্ষার্থী তার choice মতো চারটি রাজ্য select করতে পারবে এবং পরবর্তীতে Rank অনুসারে সম্ভাব্য রাজ্যে পড়ার সুযোগ পাবে – ফলতঃ রাজ্যের ৮৫ শতাংশ কোটা আক্রান্ত হবে এবং ভবিষ্যতে রাজ্যের নিজস্ব

স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। তাই রাজ্যের ৮৫ শতাংশ কোটা যাতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে কোনও ধোঁয়াশা থাকা উচিত নয়।

ঘ। রাজ্য Joint Entrance Board যেভাবে পরীক্ষার্থীর কথা ভেবে মফঃস্বল / গ্রামাঞ্চলে সুষমভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে – ঠিক সেই অনুপাতে NEET এর Centre গড়ে তোলা কী সম্ভব (অন্যান্য জাতীয় পরীক্ষার অভিজ্ঞতা ঠিক সেরকম নয়)।

যেহেতু এই নির্দেশনামা বলে এই প্রত্যাশা তৈরী হয়েছে, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে পৃথক পরীক্ষা ব্যবস্থা ও ক্যাপিটেশন ফি থাকবে না এবং বাণিজ্যীকরণ কমবে। কিন্তু National Health Policy-তে ছত্রে ছত্রে পণ্যায়ন ও বেসরকারীকরণের উপাদান মজুত আছে, সেখানে এই মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থ কী ক্ষুন্ন করা সম্ভব? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে এবং ২০০৩ ও ২০০৫ সালের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ১১জন বিচারপতির বেঞ্চ ও ৭জন বিচারপতির বেঞ্চ, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে পৃথক পরীক্ষা নেওয়ার অনুমোদন দেয় – তাই গোটা বিষয়টিতে বিভ্রান্তি থাকল। এছাড়াও, ক্যাপিটেশন ফি তুলে দিয়েও Annual Tution Fee Structure Reorganise করে মুনাফা ধরে রাখা সম্ভব। রাজ্যের গ্রামীণ অংশের প্রত্যাশী ছাত্রছাত্রীরা NEET পরীক্ষার আড়ালে কিছু দালালবেশী বিজ্ঞাপন সংস্থার পাল্লায় পড়তে পারে – যা আরও এক প্রকার আর্থিক দুর্নীতির জন্ম দিতে পারে।

দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রশ্নে Modern Medicine ছাড়াও আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি, ইউনানী প্রভৃতি system-এর চিকিৎসক রয়েছেন – তাদের যোগ্যতা নির্ধারণ পরীক্ষার ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত অনুচ্চারিত।

আমাদের রাজ্য সরকার আজকে কুমীরের কান্না কাঁদলেও দীর্ঘদিন সময় পেয়েও এ বিষয়ে যথোপযুক্ত প্রস্তুতি ও উদ্যোগ না দেখিয়ে চরম ঔদাসীন্য প্রকাশ করেছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্য সরকার অনতিবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের Constitutional Bench-এ Review Petition করা উচিত – প্রায় লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে।

অপমান

আর্যতীর্থ

ভরে আছে পুরো ঘর, এদিকে ওদিকে
জমে আছে বেশ ভিড়।
অশুভ এক আগামীর আশংকায়
পৃথিবীও হয় অস্থির।
অঘটন ঘটতে চলেছে কিছু, বাতাস
থমথমে অপেক্ষায়।
ওই তো, একই সাথে হুংকার ও
আর্তনাদ শোনা যায়।
হুংকার, সবল ক্ষমতাশালী
অত্যাচারীর, সংখ্যাধিক্যে বলীয়ান,
কিছুক্ষণ আগেই শোনা গিয়েছে আদেশ
'যা ওর কেশ ধরে টেনে আন,
হিঁচড়িয়ে নিয়ে আয় আমরা যেখানে
আছি সেই সভা মাঝে,
ওর কোনও অজুহাত, কোনও অনুনয়
আজ শোনা হবে না যে!
নিয়ে আয়, বলা হবে এই পরিস্থিতি,
এই তাবত ক্ষয় ও ক্ষতির দোষ পুরো
ওর ঘাড়ে,
আমাদের যা ইচ্ছে, তাই করা হবে ওর
সাথে, দেখি আজ কে বাঁচাতে পারে।'
ওই শোনো আকুল আর্তনাদ সেই
রমণীর, চিৎকারে দেওয়ালেরও বুক
যেন ফাটে,
অনন্ত অপমান করা যাবে ভেবে
ক্ষমতারা লোভী জিভ চাটে,
ওই দেখো, জনতার মাঝে অপমানিত
হতে ওরা নিয়ে এলো কৃষ্ণাকে...

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাগণ, যদি ভাবেন
আওড়াচ্ছি আমি মহাভারত কথাকে,
ভুল করবেন। এ কৃষ্ণা দ্রুপদকন্যা
পাঞ্চালী নন, আমার বা আপনার খুব
চেনা জন,
ঢাল তরোয়ালহীন নিধিরাম হয়ে স্বাস্থ্য
সামলানো এক সরকারি চিকিৎসক,
দুর্ভাগ্যবশত তিনি নারীও বটে।
শোনেননি নাকি? কিভাবে আন্ত্রিকে
শিশু মারা গেলে, জনতা করেছে তাঁর
তড়িৎ বিচার?
মারধোর, অশ্লীল গালাগালি সহ,
বস্তুত, না পালালে প্রাণ যেত তাঁর।
দ্বাপরের কৃষ্ণার ইজ্জত বেঁচেছিলো
মথুরানরেশ সখা কৃষ্ণের হাতে,
ভাগ্যের পরিহাসে এটাও মথুরাপুর,
যদিও আসেনি কোনও বন্ধু বাঁচাতে।
ডাক্তার নিগ্রহে বাধা দিয়ে ক্ষমতার
বিরুদ্ধে যাবেন,
এই যুগে কৃষ্ণরা বোকা নন অত,
তদন্ত ব্যতিরেকে মারধোরে বিশ্বাসী
ইদানিং জনতার খাপ আদালতও,
সুতরাং কৃষ্ণা ও কেয়া'রা নিত্য
অপমানের কাদা মেখে রোগী দেখে
যান,
আজকে মথুরাপুর, বোলপুরে
কাল, প্রতি জেলা কোণে চলে একই
উপাখ্যান।

প্রতি সভ্যতা জানে দুর্যোধন
দুঃশাসনেরা বস্তুত শাসকের
অন্ধতাজাত,
কৃষ্ণার অপমানে ধিকিধিকি প্রতিবাদে,
আবার কুরুক্ষেত্র হবে না তো?

বিশ্বকাপের থেকেও বিশ্বটা অনেক বড়

ডাঃ গৌতম দাস (ফেস বুক থেকে সংগৃহিত)

১৯৩৮ সাল। ফেব্রুয়ারী মাস। অফিসিয়ালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনো শুরু হয় নি। হিটলারের জার্মানি দখল করে নিলো প্রতিবেশী দেশ অস্ট্রিয়া। সেই সময় অস্ট্রিয়ান ফুটবল দল সারা পৃথিবীতে 'ওয়ান্ডার টিম' নামে খ্যাত ছিল তাদের শৈল্পিক ফুটবল আর অপরাজেয় মানসিকতার জন্য। আর তাদের দলনায়ক ওই সময়কার বিশ্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার 'Mozart of Football' ম্যাথিয়াস সিন্ডেলার। দুর্ধর্ষ ড্রিবলার, দু'পায়েই দারুণ শট, সৃজনশীল সেন্টার ফরোয়ার্ড। আর সাথে সাথে একজন স্বাধীনচেতা মানুষ। ওই বছরের ৩রা এপ্রিল জার্মানি আর তাদের অধিকারে থাকা অস্ট্রিয়ার মধ্যে ফুটবল ম্যাচ। নাৎসি বাহিনীর পরিস্কার নির্দেশ ম্যাচ ড্র রাখতে হবে। জার্মানিকে হারানো যাবে না। কিন্তু দলনায়ক সিন্ডেলার তা মানতে নারাজ। তার ইচ্ছানুযায়ী চিরাচরিত সাদাকালো রঙের বদলে অস্ট্রিয়ান জাতীয় পতাকার রঙের লাল-সাদা-লাল জার্সি পরে ম্যাচ খেলতে নামল অস্ট্রিয়া। প্রথমার্থ গোলশূন্য রইলো। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে টীম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজে দলকে অনুপ্রানিতই শুধু করলেন না, প্রথমে একটা গোল করে নাৎসি অফিসারদের সামনে আনন্দ করলেন। তারপর সহ খেলোয়াড় সেস্তাকে দিয়ে আরেকটা গোল করালেন। ম্যাচের স্কোর পরাধীন অস্ট্রিয়া ২-হিটলারের জার্মানী ০। বিষয়টা ভালোভাবে নেন নি স্বয়ং ফুহেরার। এর পরেও সেই বছরেই বিশ্বকাপ ফুটবলে তাদের বলা হলো জার্মানীর হয়ে খেলতে। কিন্তু না, শুধু সেই বিশ্বকাপ নয় কোন দিনই সিন্ডেলার জার্মানীর হয়ে নামেন নি। বলেছিলেন জোর গলায়, ''কোনও দিন খেলবো না, তবুও ওদের হয়ে খেলতে নামবো না।'' ফলে স্বাভাবিক ভাবেই যা হওয়ার তাই হলো, ১৯৩৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী এই মহান শিল্পী ফুটবলার আর তার প্রেমিকাকে ঘুমের মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে হত্যা করলো নাৎসীরা। সিন্ডেলার মারা গেলেও বেঁচে থাকলো তার ল্যেগাসি। ফুটবল বিপ্লবীর ল্যেগাসি।

যেই ল্যেগাসি অনেক পরে বহন করবার দায়িত্ব নিলেন আর একজন চিরশ্রেষ্ঠ। যোহান ক্রুয়েফ। ওই সময়ের দুর্ধর্ষ নেদারল্যান্ড দলের প্রাণভোমরা। ১৯৭৪ বিশ্বকাপের গোল্ডেন বল জয়ী। ১৯৭৮ সাল। বিশ্বকাপের আসর বসেছে আর্জেন্টিনায়। সে দেশে তখন সেনা শাসন। গণতন্ত্র হত্যা হচ্ছে প্রতিদিন। প্রেস মিট ডেকে সেই ক্রুয়েফ ঘোষণা করলেন, ''যে দেশে মানুষের কোন মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত নয়, সেখানে গণতন্ত্র প্রতি মুহূর্ত ধর্ষিত হচ্ছে, সেখানে আমি বিশ্বকাপ খেলতে যাবো না।'' হ্যাঁ, যাননি ক্রুয়েফ। শত অনুরোধেও যাননি। মানব অধিকারের জায়গাটা সবচেয়ে ওপরে, বুঝিয়েছিলেন তিনি। নেদারল্যান্ড দ্বিতীয়বারের জন্য রানারস্ হয় সেইবার।

ব্যাটনটা এবার বিশ্বফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনার হাতে। ১৯৮৬, মেক্সিকোতে বসেছে বিশ্বকাপের আসর। পিটার শিল্টন, ব্রায়ান রবসন, গ্যারি লিনেকারদের ইংল্যান্ড-এর সাথে কোয়ার্টার ফাইনাল। সেই ইংল্যান্ড, যারা গায়ের জোরে দখল করে রেখেছে ফকল্যান্ড দ্বীপ। যারা প্রতিদিন সেখানে মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। খেলা শুরু হবে, জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়ে গেছে, এই রকম সময়ে দলনায়ক মারাদোনা বলে উঠেলেন, ''ওই দেখো ইংল্যান্ড দল দাঁড়িয়ে আছে, জানি ওই প্লেয়ারগুলোর কোনো দোষ নেই, কিন্তু ওরা যে রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করছে তারা আমাদের দেশের অংশ দখল করে রেখেছে, ফকল্যান্ডের ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলোকে হত্যা করেছে। আজ ওদের হারাতেই হবে, দেশের জন্য''। আর তারপরেই সেই, ''Hand of God'' আর ''Goal of the century''। সেই এক ম্যাচেই। এর অনেক পরে তিনি ফিদেল কাস্ত্রোর পাশে, উগো চাভেজের সাথে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে কোনো লড়াইতে অংশীদার। জোর গলায় বলেছেন, ''I think Bush is a murderer. I am going to head the march against him stepping foot on Argentine soil

... I believe in (Hugo) Chavez, I am Chavista. Everything Fidel (Castro) does, everything Chavez does, for me is the best.", সেই শক্তিশালীর সামনে শিরদাঁড়া না বাঁকানোর ঐতিহ্য। সেই ল্যেগাসি।

১৯৮৮ সাল। ইউরো কাপ জিতেছে নেদারল্যান্ড। দলনায়ক, সে বছরের ব্যালন দি অঁর "Black Tulip" রুদ গুলিত। সেই ঝকড়া বিনুনি করা চুলের মালিক গুলিত। সারা মাঠ জুড়ে অসম্ভব পরিশ্রম করে খেলা গুলিত। দেশে ফিরেই ঘোষণা করে দিলেন প্রাইজমানি বাবদ প্রাপ্ত সব অর্থ তিনি বিশ্বজুড়ে কালো মানুষের মুক্তির সংগ্রামে দিয়ে দিচ্ছেন। এবং তিনি তা করেওছিলেন।

২০১৪ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ান টীমের তুর্কি বংশজাত জার্মান প্লেয়ার মেটুস ওজিল তার প্রতিযোগিতার সমস্ত পুরস্কার মূল্য প্যালেসস্টাইন যুদ্ধ বিদ্ধস্ত মানুষদের জন্য দান করে দেন।

১৪ই জুন থেকে শুরু হচ্ছে ফুটবলের মহাযজ্ঞ। পাবো কি আমরা এরকম আর কোনো মহানায়ককে? যে বিশ্বকাপ জয়ের চেয়েও বেশী করে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবমুক্তির চেতনাকে জয়ী করতে চাইবে? নাকি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি? কোনো এক লিওনেল মেসির মধ্যে?

গত কয়েকদিন আগে, সব দলগুলোই যখন প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে বেড়াচ্ছে, সারা বিশ্ব জুড়ে আলোড়ন আর্জেন্টিনা বনাম ইসরায়েল ম্যাচ নিয়ে। সেই সিরায়েল যারা লক্ষ লক্ষ শিশু হত্যার দায়ে অভিযুক্ত, সেই ইসরায়েল যারা প্যালেস্টাইন এর ওপর অনৈতিক দখলদারি চালিয়ে যাচ্ছে, মানবাধিকার যাদের কাছে একটা শব্দ ছাড়া কিছুই নয়, তাদের সাথে খেলা। এইরকম এটা টুর্নামেন্টের আগে প্রস্তুতি ম্যাচগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু ল্যেগাসিটা তো কাউকে বহন করতেই হতো। মেসি শুধু এই ম্যাচ খেলবেন না এই সিদ্ধান্তই নিলেন না নিজের দলের বাকী খেলোয়াড়দের না খেলার জন্য রাজী করালেন। তারপর কোচ আর সব শেষে নিজের দেশের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকেও রাজী করিয়ে এই ম্যাচ বাতিল করাতে বাধ্য করলেন। আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ১৪ লক্ষ আমেরিকাডলার ক্ষতি করে, স্পন্সরদের চাপ উপেক্ষা করে, ফিফার থেকে ব্যান হওয়ার ভয়কেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে মানবতার পাশে দাঁড়ালো। সৌজন্যে লিওনেল মেসি। নেপথ্যের নায়ক লিওনেল মেসি।

তিনি এক সাক্ষাতকারে TYC sport-কে বলেছেন, "As a UNICEF ambassador I cannot play against people who kill innocent palastinian children. We had to cancel the game because we are humans before footballers"।

হ্যাঁ "Humans before footballers"। মেসি, মারাদোনা, ক্রয়েফ, গুলিত, সিন্ডেলাররা তাই ..... আগে মানুষ। বিশ্বকাপ সবাই জেতে না। মারাদোনা একবার এই স্বাদ পেলেও ম্যাথিয়াস সিন্ডেলার জেতেননি, ক্রয়েফ জেতেননি, গুলিত জেতেননি। কিন্তু এরা সবাই বিশ্ববাসীর হৃদয় জিতেছেন। যেরকম জিতেছেন মেসি। তার খেলা দিয়ে, তার সিদ্ধান্ত দিয়ে। বিশ্বকাপ এবারে মেসির আর্জেন্টিনা জিতবে না অন্য কোনো দেশ সেটা পরে জানা যাবে। কিন্তু মেসি যে ইতিমধ্যেই "বিশ্ব" জয় করেছে সেটা নিঃসন্দেহ। আর কে না জানে, বিশ্বকাপের থেকেও বিশ্বটা অনেক বড়।